বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও বর্ণপরিচয়

সন্তোষ কুমার অধিকারী

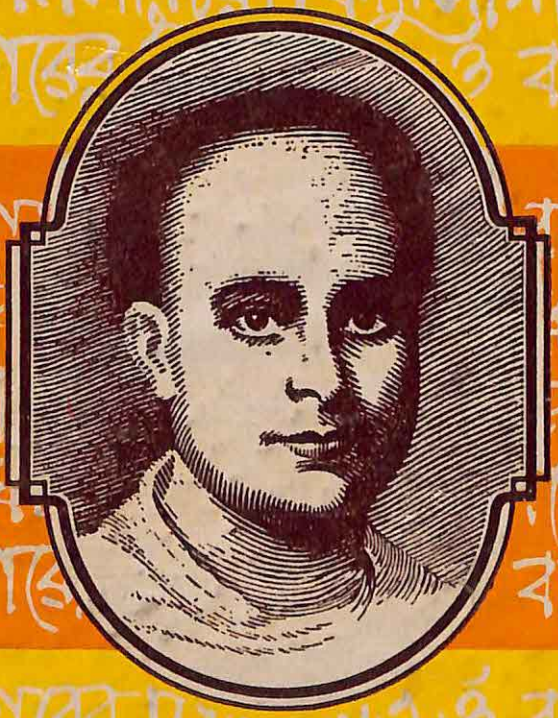

বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও বর্ণপরিচয়

সন্তোষকুমার অধিকারী

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, S. C. Road

অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল)
কলিকাতা-৭৩

923.6
SAN

.C.E.R.T. West Beng.
Date 2.3.92
Acc. No. 5244

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭ নভেম্বর, প্রকাশক : হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন ৬৬, কলেজ স্ট্রিট (দ্বিতল) কলিকাতা-৭৩, মুদ্রাকর : নিতাইচন্দ্র জানা, জয়তারা প্রেস, কলিকাতা-৭০০০০৬, প্রচ্ছদ : ধীরেন শাসমল।

মূল্য : ১৬·০০

ভূমিকা

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশের শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি নিজেদের হাতে গ্রহণ করে ; ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। কলকাতাই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম রাজধানী। ১৭৭৯-তে সুপ্রিম কোর্ট এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি কলকাতায় স্থাপিত হয়। স্থায়ী ও গ্রহণ-যোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবার দিকে লক্ষ্য রেখে হেষ্টিংস যে নীতি গ্রহণ করলেন, তাতে ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও আইন ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেল ; কলকাতা যে শুধু ভারতের নয়, এশিয়ার সংস্কৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠবে, এমন একটি আশাও হেষ্টিংস মনে মনে পোষণ করতেন। "In 1773 he already enivisioned Calcutta as···the first city in Asia." [Memoirs of Hastings, I, 285 Letter to M. Sykes.]

উল্লেখ্য, কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় বাংলা-ভাষাই প্রথম সংস্কৃতানুগ দেশীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের কাছে চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হেষ্টিংসের প্রেরণা ও উইলকিনসের সহায়তায় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড্, ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, যখন এদেশে কোন মুদ্রণ ব্যবস্থা ছিল না তখন, 'বাংলাভাষার ব্যাকরণ' রচনা করে মুদ্রিত করলেন। বলা বাহুল্য এই কাজ শুধু অসাধারণ শ্রমসাধ্য ব্যাপারই নয়, বাংলাভাষার শরীরে প্রথম প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা। হ্যালহেডকে এই বই ছাপতে বাংলা হরফ তৈরী করতে হয়েছিল এক পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে।

হ্যালহেডের পর উইলিয়াম কেরীর অক্লান্ত প্রয়াস বাংলাভাষা ও গদ্যের শরীর নির্মাণের জন্য। দেশীয় ও বিদেশী অনেক সাধকের

চেষ্টা যুক্ত হয়েছে এই কাজে। কিন্তু দ্বিতীয় সোপানটি যিনি নির্মাণ করলেন, তিনি হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষার পথে বর্ণমালার সুষ্ঠু ও আকর্ষক বিন্যাসকে প্রথম সোপান বলেই বর্ণনা করা যায়।

বর্ণপরিচয়—বাংলাভাষা শিক্ষা—জনশিক্ষা ও শিক্ষার সংস্কার এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি,…বিদ্যাসাগরের মূল লক্ষ্য ছিল আধুনিক চেতনা সম্পন্ন, সংস্কার মুক্ত এক সমাজ গঠন। আধুনিক ভারতের ইতিহাস রচনায় তাই 'বর্ণপরিচয়'-এর স্থান স্বীকৃত এবং স্মরণীয়।

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭। সন্তোষ কুমার অধিকারী

পুনশ্চ : ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীর সম্পাদক (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস) 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ষষ্ঠীতম সংস্করণ সম্পাদকীয় নিবেদনে বলেছেন,—"পুরাতন বর্ণপরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।"

দি ব্রিটিশ লাইব্রেরী (প্রিজারভেসন সেকসন) লণ্ডন, বর্তমান লেখককে একবিংশ মুদ্রণের জেরক্স কপি দিয়েছেন ; তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

বাংলা ভাষা ও বর্ণপরিচয় — ৯
বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি — ৩৫
বর্ণপরিচয়—প্রথম ভাগ (একবিংশ মুদ্রণ থেকে) — ৭৩
পরিশিষ্ট : সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন
সংক্রান্ত রিপোর্ট — ৯৯
শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক
ডঃ মোয়াটকে লেখা চিঠি — ১১৪
বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য — ১২২
শিক্ষাপরিদর্শকের মন্তব্য এবং
শিক্ষা সম্পর্কিত নোট — ১২৬

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য

৺ ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণীয়েষু

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা ২০ বিশ সংখ্যক পংক্তিতে এবং পাদটিকায়
ষষ্ঠীতম সংস্করণ এর স্থলে ষষ্টিতম সংস্করণ হবে।
পৃষ্ঠা ২১ একাদশ পংক্তিতে
ষষ্ঠীতম সংস্করণ এর স্থলে ষষ্টিতম সংস্করণ হবে।
পৃষ্ঠা ২৩ পঞ্চদশপংক্তিতে
ষষ্ঠীতম সংস্করণ এর স্থলে ষষ্টিতম সংস্করণ হবে।
পৃষ্ঠা ২৮ অষ্টম পংক্তিতে
ষষ্ঠীতম সংস্করণ এর স্থলে ষষ্টিতম সংস্করণ হবে।

পৃষ্ঠা ১১৩ দশম পংক্তিতে
১০ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ এর স্থলে ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৫০ হবে।

পৃষ্ঠা ১১৪ আরম্ভে
ডঃ মোয়াটকে লেখা চিঠিটি ৭.৯. ১৮৫৭ স্থলে
০. ৯. ১৮৫৩ পড়তে হবে।

এই লেখকের

বিদ্যাসাগর
আধুনিক মানসিকতা ও বিদ্যাসাগর
বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি
শহীদ যতীনদাস ও ভারতের বিপ্লব
আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ ও ভগৎ সিং
বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী
দিগন্তের মেঘ, অন্য কোনখানে, পাড়ি

বর্ণপরিচয়।

প্রথম ভাগ।

অসংযুক্ত বর্ণ।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

একবিংশ বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯১৮।

মূল্য তিন পয়সা।

বর্ণ পরিচয়ের পরীক্ষা।

অ এ ঋ ই

ও ঌ ঐ ঊ

ঔ ঈ আ উ

FIFTY letters, in the following order.

First Series.

অ o	আ aa	ই ee	ঈ ee
উ oo	ঊ oo	ঋ ree	ৠ ree
ঌ lee	ৡ lree	এ a	ঐ i
ও o	ঔ ou	ং ung	ঃ oh

Second Series.

ক ko	খ k,ho	গ go	ঘ g,ho	ঙ
চ cho	ছ chr,ho	জ jo	ঝ j,ho	ঞ
ট to	ঠ t,ho	ড do	ঢ d,ho	ণ
ত to	থ t,ho	দ do	ধ d,ho	ন
প po	ফ p,ho	ব bo	ভ h,ho	ম
য jo	র ro	ল lo	ব wo	
শ sho	ষ sho	স so	হ ho	ক্ষ

CONSONANTS

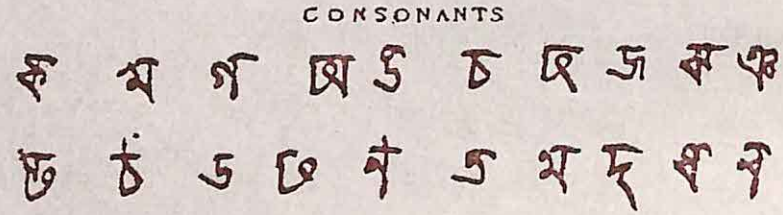

CONNECTED VOWELS.

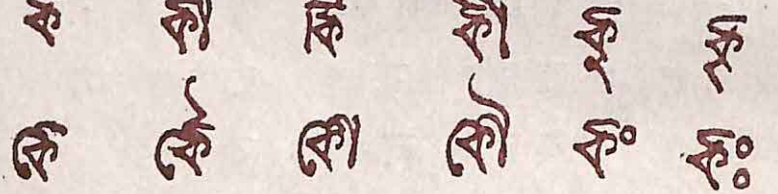

হলহেডের জেণ্ট-ল' গ্রন্থে প্রদর্শিত বঙ্গীয় বর্ণমালা। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ

জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রগতিচিন্তার বাহন হ'ল তার ভাষা। যে ভাষায় সে জন্মাবধি কথা বলছে, তার পিতা মাতা ও পূর্বপুরুষ যে ভাষায় নিজেদের মনের ভাবকে প্রকাশ করেছে সেই ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষাতেই মানুষ অনুভব করে তার জীবনকে, ব্যক্ত করে তার মনের ভাবনাকে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে হোক বা জাতির ক্ষেত্রে হোক জনশিক্ষার বাহন হতে পারে মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় শিক্ষার পথ বন্ধ করার অর্থ হ'ল একটি জাতির বৃহত্তর অংশকে অশিক্ষার মধ্যে রাখা এবং তার সংস্কৃতির বিকাশের পথকে রুদ্ধ করা।

ত্রয়োদশ শতকে অর্থাৎ বঙ্গদেশ মুসলমান সুলতানদের হাতে যাওয়ার পর থেকেই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতার একটি বিবরণ দিয়েছেন অ্যাডাম. তাঁর সেই বিবরণী থেকে জানা যায়—পাঠশালার উর্ধ্বে উচ্চশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষার মধ্যে। শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, ধর্ম ও সামাজিক আচার, নীতিমূলক লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী, এবং অবশ্যপালনীয় কিছু নিয়ম ও আইন। মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অথবা তার স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে এগুলির কোন মূল্যই ছিল না।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে অ্যাডামের মন্তব্য—স্ত্রীশিক্ষার কোন প্রচলন ছিল না। বরং এমন একটি সংস্কার হিন্দু সমাজে চলিত ছিল যে, লেখাপড়া শিখলে নারী বিধবা হয়।

এ'দেশে তখনও ছাপার প্রচলন হয়নি। পাঠশালাগুলিতে

লিখিত পুঁথিও ছিল না। শিক্ষকদের মুখ থেকে শুনে পাঠ্যবস্তু মনে রাখতে হ'ত ছাত্রদের। সংস্কৃত টোলে 'স্মৃতি' ও 'ন্যায়' কিছুটা এবং মক্তব ও মাদ্রাসায় 'কোরাণ' অবশ্য শিক্ষণীয় ছিল। অ্যাডামের বিবরণীর উপসংহারে বলা হয়েছে

"……there was nothing in the system of instruction which could awaken and expand the mind of the young scholar and free it from the trammels of mere usage." *[১]

বাংলা কথ্যভাষা বাংলাই ছিল, এমনকি পদ্য লেখা বা গান বাঁধা হত বাংলাতেই। কিন্তু বাংলা গদ্যের কোন চলন ছিল না। কারণ সরকারী ও আদালতের ভাষা ছিল ফারসি। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা চিঠিপত্র লিখতেন সংস্কৃতে আর মুসলমানরা উর্দুতে। উচ্চ-বর্ণের মানুষেরা কথাবার্তাতেও সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন।

সতরশ' তিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল পদে বৃত হয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে দৃঢ় করবার অভিপ্রায় নিয়ে যে সংস্কারমূলক কাজগুলিতে হাত দিলেন তার মধ্যে একটি হ'ল বাংলা-ভাষা ও বাঙ্গালীর সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া। হেষ্টিংস বুঝেছিলেন যে স্থানীয় অধিবাসীদের মনোভাবকে অনুকুলে রাখতে হলে তাদের ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার জানতে হবে। ইংল্যাণ্ড থেকে যেসব কর্মচারী প্রশাসনে সাহায্য করতে এদেশে এল তাদের দেশীয় ভাষা ও রীতি নীতিতে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হ'ল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। আর ঐ কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন ডাচ মিশনারী উইলিয়াম কেরী।

প্রশাসনিক সহায়তা ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল, যার ফলে বাংলাভাষা সেদিন প্রাধান্য পেয়েছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বুঝেছিলেন যে, এদেশের মানুষকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে হলে

১। অমিতাভ মুখার্জি—রিফর্ম অ্যাণ্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল।

পৃঃ—১৩

তাদের ভাষা ও ধর্ম জানতে হবে। তবে কেরীর বাংলা ভাষার প্রতি প্রীতি হয়ত আন্তরিক ছিল। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত উক্তিগুলিই তাঁর সেই আন্তরিকতাকে প্রমাণ করে। ১৮০১ সালে বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—The study of Bengali has been much neglected from idea that its use is very confined.[২] ঐ ব্যাকরণের ১৮১৮ সালের সংস্করণে তিনি লিখলেন, —The Bengali language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India and in point of real utility yields to none.[৩]

কেরী এবং তাঁর মুন্সীদের, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতদের চেষ্টায় বাংলা গদ্য রচনার চেষ্টা চলতে লাগল। যার ফলে বাংলা ব্যাকরণ থেকে শুরু করে প্রতাপাদিত্য চরিত্র-এর মতো বইও লেখা হ'ল। কেরী তাঁর সংকলিত ব্যাকরণ গ্রন্থে বাংলা বর্ণলিপি যে ভাবে, দিয়েছেন তার একটি আলোকচিত্র দেওয়া হয়েছে প্রথমেই।

অবশ্য কেরীর আগে এ কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড্। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত করান। তাঁর এই ব্যাকরণই বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ। মুদ্রণ কাজের জন্য হ্যালহেড্‌কেও বর্ণমালার একটি রূপ মুদ্রিত করতে হয়েছিল।

কেরী এবং শ্রীরামপুর মিশন ছাড়া বাংলাভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান বর্ণমালা রচনার কাজে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে স্কুল বুক সোসাইটি, রাজা রাধাকান্ত দেব, তত্ত্ববোধিনী সভা

২। সবিতা চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গালা সাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক। পৃঃ—৪৭১

৩। ঐ ঐ পৃঃ—৪৭২

এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নাম পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শিশু সেবধি বর্ণমালাই একমাত্র কিছুটা চলেছিল, কিন্তু কোনটিই সরকার কর্তৃক শিশুশিক্ষার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়নি।

এই অক্ষমতা বা ঔদাসীন্যের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

১৮৩৫ সাল পর্যন্ত আদালতের ভাষা ছিল ফারসি। বাংলা ভাষার কোন প্রাধান্য সরকারী মহলে ছিল না, বঙ্গভাষী সমাজের মধ্যেও না। এদেশে শিক্ষার প্রসার কোন্ ভাষার মাধ্যমে হবে—প্রাচ্য না ইংরাজী অর্থাৎ সংস্কৃত (বা উর্দু)-র মতো সর্বজন স্বীকৃত প্রাচ্য ভাষাই প্রাধান্য পাবে, না আধুনিক এবং শাসককুলের ভাষা ইংরাজী সে স্থান অধিকার করবে, তাই নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বিতর্ক চলেছে। ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে) রামমোহন যে চিঠিটি লিখেছিলেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে, সেই চিঠিতে তিনি এদেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার ওপরেই জোর দিয়েছিলেন, বাংলা ভাষার উন্নয়নের কথা বলেন নি। ওরিয়েন্টালিস্ট্ ও অ্যাংলিসিস্ট্ বিতর্কের অবসান ঘটাতে গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্ক মেকলের অভিমত চান্। মেকলের কথা অত্যন্ত রূঢ় ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন ছিল। তিনি দেশীয় কোন ভাষার কোন মূল্য দিতে অস্বীকার করেন।

সরকারী অফিসে ইংরাজী ভাষা এবং ব্রিটিশ মার্চেন্ট অফিস-গুলিতেও ইংরাজীর প্রাধান্য ছিল। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই বাংলা-দেশে সাধারণ মানুষের মনে ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখা দিল, যার জন্য সরকারী সাহায্য ছাড়াই ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হতে দেখা গিয়েছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে, ১৮১৪ তে চুঁচুড়ায়, ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ ছাড়াও কলকাতার ডাফ স্কুল, চার্চ মিশনারি স্কুল, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি,

হিন্দু ফ্রি স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলিতে ১২০০-রও বেশী ছাত্র ইংরাজীতে পাঠরত ছিল।

স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃত কলেজের গুরুত্ব ১৮৩৫ সালের পর থেকে কমে যায়। বাংলা বিদ্যালয় না থাকায় গ্রামাঞ্চলের মানুষ নিরক্ষর* ও অজ্ঞজীবন যাপন করতো। বাংলা বই থাকা দূরের কথা বাংলা গদ্যই তখন পর্যন্ত রূপ পায় নি। বাংলা ছাপাখানার সংখ্যাও নগণ্য।

এই অবস্থার মধ্যে বাংলায় প্রথম বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রচেষ্টা গভর্ণর লর্ড হার্ডিঞ্জের।

১৮৪৪ সালে গভর্ণর লর্ড হার্ডিঞ্জ্ বাংলার গ্রামাঞ্চলে ১০১টি বাংলা বিদ্যালয় খোলার অনুমতি দেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়, কারণ ছাত্রদের পড়ানোর যোগ্য বই ছিল না।

এ'কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, লর্ড হার্ডিঞ্জের এই পরিকল্পনার পেছনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এক তরুণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও কিছুটা হাত ছিল। বাংলাভাষা শিক্ষার উপযোগী ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের অভাবে বাংলা বিদ্যালয় চালু করা গেল না, এই করুণ অভিজ্ঞতাই সেদিন বিদ্যাসাগরকে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থরচনা ও মুদ্রিত করার কাজে প্ররোচিত করেছিল। অবশ্য এ কাজে তাঁর সহায় ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ জি টি মার্শাল।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্শালের প্রেরণা ও সহায়তায় বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে পুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজে হাত দিলেন। তাঁর প্রথম পুস্তক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত হয় ডি রোজারিও অ্যাণ্ড্

---

* এখনও অবস্থার খুব বেশী তারতম্য হয়নি। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৬০ জন লোকই নিরক্ষর।

কোং থেকে কিন্তু তার পরেই তাঁর নিজস্ব সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্রে ছাপা হয়ে প্রকাশিত হ'ল অন্নদামঙ্গল, বাঙ্গালার ইতিহাস, জীবন চরিত, বোধোদয় (শিশুশিক্ষা), ঋজুপাঠ, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী ও শকুন্তলা। প্রকাশকাল : ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৪। ইতিমধ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখেছেন, কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন, বেথুনের সঙ্গে হিন্দু ফিমেল স্কুলের পরিচালনায় নিজেকে যুক্ত করেছেন, এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বহু বিবাহ রোধ আন্দোলনে সমস্ত দেশে সাড়া তুলেছেন।

সংস্কৃত কলেজ সংস্কার প্রস্তাবের মধ্য দিয়েই তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর শিক্ষাসংস্কারের নীতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে শিক্ষা-পরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াটকে যে চিঠি দিলেন, তার মধ্যে। তাঁর সংস্কার প্রস্তাব অনুমোদন করেও ডঃ ব্যালেণ্টাইন কয়েকটি সুপারিশ করেছিলেন, তারই প্রতিবাদে লেখা বিদ্যাসাগরের এই চিঠিটির মূল্য অসামান্য। যে নব্য শিক্ষারীতি আজও পর্যন্ত চলে আসছে তার প্রবর্তক বিদ্যাসাগর ; উল্লিখিত পত্রটি তাঁর চিন্তা ও মানসিকতাকে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে।

তাঁর সংস্কার প্রস্তাবের দু'একটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কলেজে তখন সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ছাত্রদের পাঁচবছর ধরে মুখস্থ করতে হত। এই অযথা পরিশ্রম ও সময়ের অপব্যয় বাঁচাতে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী লিখলেন, যার ফলে সংস্কৃত শিক্ষা ছাত্রদের কাছে সহজ হয়ে গেল। সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হ'ত সকলকে। বিদ্যাসাগর ইংরাজীতে আধুনিক গণিতের শিক্ষা প্রবর্তন করলেন।

প্রথমেই স্মৃতি বা আইন বিভাগ থেকে হিন্দুধর্ম ও সামাজিক আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'অষ্টবিংশতি তত্ত্ব' পুরোপুরি বাদ দিলেন। তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অত্যন্ত দুঃসাহসিক,

তার গুরুত্বও অপরিসীম। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানালেন, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন হিন্দুজাতির মননশীলতার চরম উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে, তাই ঐ দর্শন অবশ্য পাঠ্য। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, 'সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রান্তচিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।' তাই আধুনিক ইউরোপের দর্শনগুলি, (যেমন মিলের লজিক) সঙ্গে সঙ্গে পড়ানো হোক, যাতে ছাত্ররা তুলনামূলক বিচারে অগ্রসর হতে পারে। তাঁর আর একটি প্রস্তাব,—ইংরাজী শিক্ষাকে আবশ্যিক করতে হবে। কারণ, ইউরোপের আধুনিক ভাবধারা, এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত হতে হলে ইংরাজী ভাষার মাধ্যম ছাড়া উপায় নেই।

৫ই অক্টোবর (১৮৫৩) তারিখে লেখা আর একটি চিঠিতে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন: "সম্পূর্ণরূপে মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের মুখ্য উদ্দেশ্যে আমাকে সংস্কৃত শেখাতে দিন, আর তার সঙ্গে ইংরাজীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণের সুযোগ নিতে দিন, আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, আমি এমন একদল যুবক তৈরী করে দেব, যারা তাদের রচনা ও শিক্ষণের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি পৌঁছিয়ে দেবে।" ৭ই সেপ্টেম্বরে চিঠিতে বলেছেন,—"আমরা যা চাই, তা হ'ল সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার উপযোগিতাকে পৌঁছিয়ে দেওয়া।"

শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের নীতি ও আদর্শ কি ছিল, আমরা এবার তার মূল সূত্রগুলি ধরতে পারছি—

প্রথম: শিক্ষার পাঠক্রম থেকে ধর্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি বাদ দেওয়া; (আমরা দেখেছি, অধ্যক্ষ হয়েই বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে জাতিভেদ প্রথা তুলে দিয়ে, কলেজে সর্বসাধারণের প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন)।

দ্বিতীয় ঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত হওয়াকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

তৃতীয় ঃ ছাত্রদের মনে যুক্তি ও বিচার বোধ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরী করতে চেয়েছেন।

চতুর্থ ঃ বাংলা বা মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসার আবশ্যিক বলে মনে করেছেন।

পঞ্চম ঃ শিক্ষার উপযোগিতাকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছেন।

শিক্ষাকে গণমুখী করতে না পারলে সাধারণ মানুষের মন থেকে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও অন্ধপ্রথা পালনের অভ্যাস দূর করে তাকে আধুনিক মনোভাবাপন্ন করে তোলা যাবে না। এই আদর্শ মনে ছিল বলেই, প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও দক্ষিণ বাংলার পল্লী অঞ্চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মডেল স্কুল স্থাপন করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। ঐ বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক দেওয়ার জন্য নর্ম্যাল স্কুল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার কাজেও হাত দিয়েছেন।

বাংলা সরকারের সচিব রিভার্স টমসনকে একটি চিঠিতে লিখেছেন,—শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান এতই নিচু যে, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য কোন খরচই তারা করতে পারে না।···· সরকার যদি এ ব্যাপারে মনস্থির করেন, তাহলে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের জন্য তাঁদের তৈরী হতে হবে।[৪]

পরামর্শ দিয়েই থেমে যান নি; বিদ্যাসাগর ১৮৫৩ সালে বীরসিংহ গ্রামে এবং ১৮৭৪-৭৫ সালে কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের জন্য অবৈতনিক সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন করে পথিকৃৎ হয়েছেন।

৪। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়—বিদ্যাসাগর। পৃঃ—৩৯

শিক্ষার সংস্কার ও প্রসারের ব্যাপারে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ ছিল ছকে বাঁধা। তবু বর্ণপরিচয় রচনায় (১৮৫৫ সালের ১৩ই এপ্রিল বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের প্রকাশ) তিনি এত দেরি করলেন কেন?

কারণ, তিনি চেয়েছেন বাংলা উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাংলা বর্ণমালার পরিচয় রচনা করতে। তার জন্য তাঁকেও সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়েছে; দীর্ঘদিনের প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছে।

দুই

১৮৫১ সালে বেথুন সোসাইটির মাসিক অধিবেশনে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর যে মন্তব্য করেছিলেন, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর শিক্ষাদর্শ। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন,—

"ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চির প্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।" বাংলা ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে তাঁর মনে যে সব চিন্তাগুলি সজাগ ছিল, তা সংক্ষেপে আলোচনা করে দেখতে পারি।

প্রথম: তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন শিক্ষা। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়: বাংলা বর্ণমালাকে সংস্কৃতানুগ করে রচনা করা, যাতে বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত শেখাও সহজ হয়। কারণ, তিনি মনে করতেন, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা অবশ্য করণীয়। হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মতো বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার এত দীন অবস্থায় ছিল যে, "ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবে না।" [সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব]

তৃতীয়ঃ সংস্কৃতের অনুগামী হ'লেও বাংলা ভাষায় শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতিতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের চিন্তা ছিল, বাংলা বর্ণ ও বানানকে এমন ভাবে রচনা করতে হবে, যাতে সংস্কৃতানুগ হ'য়েও বাংলা উচ্চারণের এই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

চতুর্থঃ তিনি চেয়েছিলেন বর্ণমালার একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ দিতে। এতদিন ব্যক্তি ও স্থানভেদে হরফ ও বানানেরও রূপভেদ ঘটেছে। অপ্রয়োজনীয় বর্ণ অকারণে ছাত্রদের মনে বিরাগের সঞ্চার করেছে; যুক্তাক্ষরও স্বতন্ত্র বর্ণরূপে স্থান পেয়েছে। অথচ বাংলা উচ্চারণের উপযোগী বর্ণ সংযোজিত হয়নি। বিদ্যাসাগরের ভাবনায় ছিল, এই বৈষম্যগুলির অবসান ঘটিয়ে এমন একটি বর্ণমালার সৃষ্টি করা যা সর্বজনের কাছে গ্রহণীয় হবে এবং উচ্চারণের অনুগত হবে বর্ণ ও বানান।

১৮৫৫ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের প্রকাশ। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে (ভূমিকায়) তিনি লিখেছেন,—

"বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। বহুকালাবধি বর্ণমালা ষোল স্বর ও চৌত্রিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালাভাষায় দীর্ঘ ঋকার ও দীর্ঘ ঌ কারের প্রয়োগ নাই। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ স্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড ঢ য় এই তিন ব্যঞ্জন বর্ণ পদমধ্যে অথবা পদান্তে থাকিলে ড় ঢ় য় হয়। সুতরাং অভিন্ন বর্ণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়েই পরস্পর ভেদ আছে তখন তাহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত। এই নিমিত্ত উহারাও স্বতন্ত্র

ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয় সুতরাং উহা সংযুক্ত বর্ণ, এজন্য অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।"

এই বিজ্ঞাপন থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সেকালের বাংলাভাষায় প্রচলিত ষোলটি স্বরবর্ণকে তিনি বারোটি স্বরবর্ণে কমিয়ে আনেন; বাদ দেন ঋ ৯ ং ও ঃ কে। উচ্চারণ পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখতে ব্যঞ্জন বর্ণে গ্রহণ করেছেন অনুস্বার ও বিসর্গর সাথে চন্দ্রবিন্দুকেও! ক্ষ (ক+ষ) পৃথক বর্ণ হিসাবে স্থান পায়নি কিন্তু উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্য রাখতে ড় ঢ় ও য় পৃথক বর্ণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে তাঁর 'বর্ণপরিচয়ে' স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় (১২+৪০=) বাহান্ন। পূর্বে ছিল পঞ্চাশ (১৬+৩৪)।

"অষ্টাদশ মুদ্রণের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন*,..... এই পুস্তক যে রীতিতে এতদিন মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সুকুমারমতি পাঠকবর্গের পক্ষে কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা ঘটিত, সেই অসুবিধার পরিহার মানসে বর্ণ যোজনা প্রকরণে ক্রমবিপর্যয় অবলম্বিত হইয়াছে।"

"কলিকাতা, ১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১৭"

বিপর্যয় কথাটির চলিত অর্থ বিশৃঙ্খলা বা ধ্বংস; কিন্তু এ'র আর একটি অর্থ ব্যতিক্রম। ক্রমবিপর্যয় অর্থাৎ ক্রমব্যতিক্রম।

ষষ্ঠীতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনেও একই কথা বলেছেন, "আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবর্তিত হইয়াছে; সুতরাং সেই সেই অংশে পূর্বতন সংস্করণের সহিত অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক।"

---

* শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনী কান্ত দাস সম্পাদিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীতে সম্পাদকেরা স্বীকার করেছেন,—'পুরাতন বর্ণপরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।' গ্রন্থাবলীতে তাঁরা ষষ্ঠীতম সংস্করণটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে বর্ণপরিচয়ের প্রথম বা প্রথমদিকের কোন সংস্করণ পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলে জানা যেত, কিভাবে তিনি এই বৈলক্ষণ্য ঘটিয়েছেন। তবে এ'কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শিশুদের এবং শিক্ষকদের কাছ থেকেও তিনি সকল সময়েই জানতে চাইতেন তাদের মতামত। যদি বুঝতেন, কোথাও পরিবর্তন করা দরকার, পরবর্তী সংস্করণেই তা' করতেন।

আরও বোঝা যায় যে, তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য বইয়ের চেয়ে শিশুপাঠ্য 'বর্ণপরিচয়' সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা অনেক বেশী ছিল। তার কারণ, বাংলাভাষা শিক্ষার প্রথম সোপানটি তিনি কষ্টিপাথর দিয়ে বাঁধাতে চেয়েছেন।

ষষ্ঠীতম সংস্করণের বিজ্ঞাপনটি পুরো উদ্ধৃত করছি, আমার বক্তব্যের সমর্থনে।

……"প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, বালকেরা অ, আ, এই দুই স্বর্ণ স্থলে স্বরের অ, স্বরের আ, বলিয়া থাকে। যাহাতে তাহারা সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ এইরূপ বলে, তদ্রূপ উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।

"যে সকল শব্দের অন্ত্যবর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, উহাদের অধিকাংশ হলন্ত, কতকগুলি অকারান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা, হলন্ত—গুড়, ঘর, হাত, জল, পথ, বন ইত্যাদি; অকারান্ত—কত, ছোট, ভাল, ঘৃত, দৈব, মৌন ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ না করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রই অকারান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযোজনার উদাহরণ স্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেগুলি অকারান্ত উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, সেই সেই শব্দের পার্শ্বদেশে * এইরূপ চিহ্ন যোজিত হইল। যে সকল শব্দের পার্শ্বদেশে তদ্রূপ চিহ্ন নাই উহারা হলন্ত উচ্চারিত হইবেক।

বাঙ্গালা ভাষায় ত কারের ত, ৎ, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড ত-কার। ঈষৎ, জগৎ, বৃহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময় খণ্ড ত-কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খণ্ড ত-কারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয় পরীক্ষার শেষভাগে ত-কারের দুই কলেবর প্রদর্শিত হইল।"

কার্মাটাড়

১লা পৌষ, সংবৎ ১৯৩১ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা "

আরও একটি কথা ; বাংলা গদ্যরীতির কাঠামো নির্মাণের কাজে যাঁরা তাঁর সহযোগী কারিগর ছিলেন, যেমন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ এবং বিদ্যাসাগর নিজেও, তাঁদের গদ্য রচনা থেকে তিনি বার করতে চাচ্ছিলেন ভাষার ক্রিয়াশীলতার রূপকে। বাংলাভাষার সেই শৈশবের দিনে ভাষার আকৃতি ও ক্রিয়াশীলতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাকে সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

বিদ্যাসাগর সচেতন হয়েছিলেন যে, দেশের সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুহূর্তে শিক্ষার্থীদের হাতে ভাষার সঠিক ব্যাকরণটিকে তুলে দিতে হবে, যাতে তারা ভাষার সমস্ত উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করতে পারে।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি বাংলাগদ্যের ভাষা, জড় পদার্থের মত অনড় হ'য়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগর যে সামাজিক রূপান্তরের স্বপ্ন দেখেছিলেন, ইংরাজী ভাষা ও ভাবধারা তার পরিবেশ গঠন করেছিল কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যম না হ'লে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই পরিবর্তনকে আত্মস্থ করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাভাষার ব্যবহার রীতিকে তিনি এমন ভাবে গড়তে চেয়েছেন, যাতে সেই ভাষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ও ঈপ্সিত অর্থকে প্রকাশ করা যায়। এই কাজের মধ্যে তাঁর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতিফলন হয়। তিনি ইংরাজী বা ইউরোপীয় ভাবধারাকে

প্রকাশের উপযোগী সংস্কৃত শব্দ আহরণ করে, তাকে বাংলা ভাষায় নতুন রূপ দিলেন। বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য তার ধ্বনিতে। এই ধ্বনি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও নব্য দর্শন চিন্তাকে রূপ দিতে সংস্কৃত পদ সংগ্রহ করার ওপরে জোর দিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর (১৮৫৩) ডঃ মোয়াটকে লেখা তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কিত চিঠিতে এই কথাটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

তাঁর বর্ণপরিচয় রচনার বিজ্ঞানও এই চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা হরফের রূপের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানোই সব নয়, তাকে পরিচিত করাতে চেয়েছেন শব্দের ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার সঙ্গে। শব্দসমষ্টি দিয়ে বাক্য রচনা—যা বাঞ্ছিত বক্তব্যকে উপস্থাপিত করতে পারে এবং শব্দে সুললিত বিন্যাস যা, বক্তব্যকে পাঠকের মনে গ্রথিত করতে পারে—সংক্ষেপে ভাষাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার ব্যাকরণও তিনি দিয়ে গেলেন তাঁর বর্ণপরিচয়—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে।

একবিংশ মুদ্রণ (১৮৬২ খ্রীঃ) ও ষষ্ঠীতম সংস্করণে (১৮৭৬) তিনি অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই পরিবর্তনের ধারা তাঁর জীবিত কালে প্রকাশিতে ১৫২ সংস্করণ পর্যন্ত চলেছে। শিশুমনের প্রয়োজন ও বিকাশের ধারা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন বিদ্যাসাগর। প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি দৃষ্টি রেখেছেন বাংলাভাষা শিক্ষার প্রথম সোপানের দিকে।

সংস্কৃত ভাষার প্রাণসুধা আহরণ করেই যে বাংলাভাষার শ্রীবৃদ্ধি এ বিষয়ে সজাগ ছিলেন বলেই তাঁর তৈরী বর্ণ পরিচয় সংস্কৃতানুসারী। অথচ বাংলাভাষা ও তার উচ্চারণ পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যও তিনি রক্ষা করলেন। প্রথম ভাগে শিশুদের জন্য তিনি প্রচলিত বাংলা শব্দগুলিকেই প্রাধান্য দিলেন। শিশুমনের কাছে আকর্ষক করে তোলার জন্য নিত্য ব্যবহারের শব্দগুলির মধ্যে সহজ ও শ্রুতিমধুর

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 2.3.99
S.C.E.R.T., West Bengal
Library

যেগুলি, সেগুলিকেই বাছাই করলেন। সাজালেন এমন ভাবে, যাতে তাদের কানও তৃপ্ত হয়। যেমন,

পথ ছাড় জল খাও
হাত ধর বাড়ী যাও

অথবা

পাখী উড়িতেছে
জল পড়িতেছে
পাতা নড়িতেছে
ফুল ঝুলিতেছে।

শব্দগুলির ব্যঞ্জনার মধ্যে চিত্রময় একটি রূপও পাওয়া যায়। শিশু-মনকে যে তা দোলা দেয়, তা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতেই উদ্‌ভাসিত ঃ

"আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে, তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কাজের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

বাংলা গদ্য রচনার সময় বিদ্যাসাগর সজাগ ছিলেন যে, গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি তিনি রচনা করছেন। শকুন্তলা ও সীতার বনবাসের ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল, যদিও মধুর ও ছন্দোময়। কিন্তু বর্ণপরিচয়ের ভাষা একেবারেই চলতি বাংলা, যে বাংলাভাষা সাধারণ মানুষের ব্যবহারযোগ্য।

"আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পরি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি।"

"দেখ রাম, কাল তুমি পড়িবার সময় বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে, ভাল পড়া হয় না, কেহ শুনিতে পায় না।"

সাধুভাষার মতো বাংলা চলতি ভাষাও বিদ্যাসাগরের হাতেই গড়ে উঠেছে। এই ভাষা পরিণতি পেয়েছে পরবর্তীকালে রচিত ব্যঙ্গাত্মক 'ব্রজবিলাস', 'অতি অল্পই হইল' ইত্যাদি বইয়ে।

সেযুগে কলকাতার সামাজিক আবহাওয়ায় অশালীনতার প্রকাশ প্রবল ছিল। শিশুমনে প্রথম থেকেই সুস্থ ও শোভন ব্যবহারের নীতি গ্রথিত করা দরকার, একথা কোন সময়ে তাঁর মনে হয়েছে। তাই পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তিনি গোপাল ও রাখালের গল্প জুড়ে দিয়েছেন। নীতিকথাগুলি গল্পের মধ্যে দিয়ে বললে সহজেই শিশুমনে প্রবেশ করে; তাই গোপাল, রাখালের গল্প। একবিংশ মুদ্রণেও এই গল্প দুটি ছিল না।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগে সংস্কৃত থেকে আনা শব্দগুলির সঙ্গে তিনি বালকদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নীতি উপদেশের মাধ্যমে বালকদের একটি সুস্থ ও সৎ মন গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। এখানে নীতিকথার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত গল্পও দিয়েছেন। যেমন বলেছেন, 'চুরি করা কদাচ উচিত নয়' তেমনি গল্পের মধ্যে দিয়ে চুরি করার অভ্যাস যে মানুষকে ধ্বংস করে, তার পরিচয় তুলে ধরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের ভবিষ্যৎ চরিত্রগঠনে তার অভিভাবকদের দায়িত্ব যে যথেষ্ট, সে কথাও বুঝিয়েছেন মাসীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

শব্দ নির্বাচনকে তিনি নিখুঁত করতে চেয়েছেন। প্রথমভাগের মতো দ্বিতীয় ভাগে যুক্তবর্ণ পরিচয়েও তাঁর এই প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠেই পাই :

"নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহা অভ্যাস করিবে। কল্য

অভ্যাস করিব বলিয়া, রাখিয়া দিবে না। যাহা রাখিয়া দিবে, আর তাহা অভ্যাস করিতে পারিবে না।"

* * *

বর্ণপরিচয় রচনার আগে আর একটি বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরকে চিন্তা করতে হয়েছে। তখন বঙ্গভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলা হরফের ছাঁদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। বারাণসীর পণ্ডিতদের অক্ষরের ছাঁদ, কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের মতো যেমন ছিল না, ঢাকা, বিক্রমপুর, ফরিদপুরের বাংলা হরফও তেমনি ভাটপাড়া, নৈহাটি বা বর্ধমানের ব্যবহৃত হরফ থেকে বিভিন্ন ছিল। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড, উইলকিন্‌সিন্—পঞ্চাননের বাংলা ছাপাখানা তৈরীর আগে লেখার সরঞ্জাম ছিল শুকনো তালপাতা ও খাগের বা ময়ূরের পাখার কলম। পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়ে সিসের হরফ তৈরী করে বই ছাপার চেষ্টা করেছিলেন হ্যালহেড ও শ্রীরামপুরের মিশনারীরা। কিন্তু তাতে নানা অসুবিধে ছিল। প্রথমে হরফগুলির সর্বজন স্বীকৃত রূপ ছিল না; তাছাড়া ধাতুতে তৈরী হরফ প্রচুর পরিমাণে তৈরী করতে না পারায় মুদ্রণের কাজ খুব বেশী এগোতে পারে নি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা অক্ষরের হরফগুলি সর্বজন-স্বীকৃত একটি রূপ পেল; অক্ষরগুলি কিভাবে তৈরী করতে হবে তার নির্দেশনাও তিনি দিয়েছেন। তিনি শ্লেটে ও ব্ল্যাকবোর্ডে প্রত্যেকটি অক্ষর স্বতন্ত্রভাবে লিখে দিতেন। হরফ তৈরীর সময়ে ক, ব, ঝ, র, ধ প্রভৃতি হরফগুলিকে একটি মণ্ডলীতে দিয়েছেন, আর খ, ভ, কিম্বা ত ড প্রভৃতি হরফকে আর একটি মণ্ডলীতে নিয়ে গিয়ে অক্ষর বিন্যাসের একটি নতুন পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন, যার ফলে সেই হরফগুলির ব্লক তৈরী করা খুব সুবিধাজনক হয়েছিল।[৫] তাই একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য সাহিত্যের যেমন

৫। সন্তোষকুমার অধিকারী সম্পাদিত বিদ্যাসাগর পরিক্রমা—ডঃ অনিল বরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধমুদ্রণ শিল্পে বিদ্যাসাগর। পৃঃ—১২৮

প্রথম সার্থক শিল্পী ছিলেন, বাংলা অক্ষর প্রতিমারও তেমনি প্রথম সার্থক স্রষ্টা ছিলেন।

*　　*　　*

বর্ণপরিচয় রচনার পূর্বে ১৮৪৯-৫০ সালে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেই তাঁর বন্ধু ও মুদ্রণযন্ত্রের অংশীদার মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' লিখেছিলেন তিন খণ্ডে। এই তিন খণ্ডে বর্ণমালা, বানান শিক্ষা ও উচ্চারণ শিক্ষার বিষয় ছিল। বিদ্যাসাগর নিজেই এই বইটিকে অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু বর্ণমালার পরিচয় এবং বানান সম্বন্ধে শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে 'শিশুশিক্ষা' অনুপযুক্ত বিবেচিত হয়। তারপরেই বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' রচনা সম্বন্ধে চিন্তা আরম্ভ করেন।

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের প্রথম প্রকাশ ১৮৫৫ খ্রীঃ-র ১৩ই এপ্রিল। প্রথমবারেই মুদ্রিত হয় ৩০০০ সংখ্যক বই। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ তিনবছরের মধ্যেই এগারোটি মুদ্রণ ছাপতে হয়। এই এগারোটি মুদ্রণে মোট ৮৮০০০ বই ছাপা হয়। ১৮৯০ সালের মধ্যে অর্থাৎ তাঁর জীবিতকালে বিদ্যাসাগর ১৫২টি মুদ্রণ বা সংস্করণে ৩৩,৬০,০০০ বই ছেপেছিলেন।[৬]

দ্বিতীয় ভাগের প্রথম প্রকাশ ১৪ই জুন ১৮৫৫ খ্রীঃ। তাঁর জীবিত কালে দ্বিতীয় ভাগের ১৪০টি মুদ্রণ/সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বই ছাপা হয় ১৫,৯০,০০০।

বর্ণপরিচয় প্রকাশের আগেই বিদ্যাসাগরের ছাত্রপাঠ্য অন্যান্য কিছু বই, বোধোদয়, ঋজুপাঠ ও জীবন চরিত প্রভৃতি বেরিয়েছে। অনেকে প্রশ্ন করেন, বর্ণপরিচয় তিনি এত বিলম্বে

৬। বিনয়ভূষণ রায়—শিক্ষা সংস্কারে বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়। পৃঃ—২৪ ও ৪০

লিখলেন কেন। এর একটি কারণ, তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ সালে শিশুশিক্ষার বই লেখায় মন দিয়েছিলেন। বন্ধুর ও সহযোগীর জন্যই বিদ্যাসাগর 'শিশুশিক্ষা'র চতুর্থ ভাগ লেখেন, যা পরবর্তী কালে বোধোদয় নামে পরিচিত।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগের ৫৯ সংস্করণ পর্যন্ত কোন বই এ দেশে পাওয়া যায়নি। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলীতে ষষ্ঠীতম সংস্করণটি মুদ্রিত হয়েছে। 'দি ব্রিটিশ লাইব্রেরী' (লণ্ডন)-এর সৌজন্যে পাওয়া একবিংশ মুদ্রণ (১৮৬২ খ্রীঃ) থেকে এখানে মুদ্রিত করা হল।

আর একটি কথা বলা দরকার। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পান ক্ষীরোদনাথ সিংহ। এ ব্যবস্থা বিদ্যাসাগর তাঁর উইলে করে গিয়েছিলেন। পুত্র নারায়ণ—"যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী", এজন্য তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। কিন্তু পিতার মৃত্যুর একবছরের মধ্যেই হাইকোর্টে মামলা করে, কেউ প্রতিবাদী না থাকায় পুত্র নারায়ণই সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেন হাইকোর্টের আদেশে।[৭] এরপর উইলের পিতৃদত্ত নির্দেশকে উপেক্ষা করে ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, দুঃস্থ বিধবা ও উইলে নির্দিষ্ট অন্যান্যদের প্রাপ্য মাসোহারা ফাঁকি দিয়ে নারায়ণ যথেচ্ছভাবে খরচ ও টাকা ধার শুরু করলেন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে নলিনীবালা দেবী, সরযূবালা দেবী ও আরও কয়েক ব্যক্তির আবেদনে হাইকোর্টে উইলের ব্যাপারটি পুনর্বিবেচিত হয়। ফলে, নারায়ণের হাত থেকে তত্ত্বাবধানের ভার যায় রিসিভার জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র এবং তাঁর পরে প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর

৭। সন্তোষকুমার অধিকারী—বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি। পৃঃ—১২৪

হাতে। হাইকোর্টের নির্দেশে ১৯০৬ সালের ১৬ই জুন নারায়ণ বিদ্যাসাগরের সম্পত্তির যে লিখিত বিবরণ দেন, তার মধ্যে তাঁর গ্রন্থাবলীর কপিরাইট সম্পর্কে নারায়ণের বক্তব্য—[৮]

"বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলির কপিরাইট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চলে গিয়েছে; কেবলমাত্র নিচের বইগুলিই এখনো আছে, আর এগুলির থেকে আয় হয় মাসে ৩০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা।

"আখ্যানমঞ্জরী ৩ খণ্ড, স্বরচিত জীবনচরিত, ভ্রান্তিবিলাস, বহুবিবাহ, পদ্যসংগ্রহ, মহাভারত, বিধবাবিবাহ বিচার, মেঘদূত (সংস্কৃত), উত্তরচরিত (সং), কাদম্বরী (সং), হর্ষচরিত (সং), শ্লোকমঞ্জরী (সং), Poetical Selections."

নারায়ণের এই বিবরণীতে 'বর্ণপরিচয়' নেই। কারণ ইতি-পূর্বেই যেসব বইয়ের বিক্রী বেশী, সেগুলিকে তিনি হস্তান্তরিত করেছেন। নারায়ণের বিবৃতির পরবর্তী অংশ—

"২৯ শ্রাবণ (১৩১০ বঙ্গাব্দ) থেকে প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দানপত্রের বলে পুস্তকালয়ের ভার গ্রহণ করে। সে অনেকগুলি নিজে সম্পাদনা করায় ঐ সব বইয়ের কপিরাইট এখন তার। ঐ বইগুলি থেকে মাসে এখন ১২০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়।"

পরবর্তীকালে দেখা যায়, প্যারীমোহন সম্পাদিত ঐ বইগুলি রিসিভার পি· কে. রায়চৌধুরী তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বন্ধক রেখেছেন। ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯১৩ খ্রীঃ) শ্রীমতী মাখনবালা দাসীর (পান) কাছে গ্রন্থস্বত্ব বন্ধক দেওয়া হয় যে বই ক'টি, তাদের নাম ঃ

বর্ণপরিচয়—১ম ও ২য় ভাগ, বোধোদয়, কথামালা, চরিতাবলী,

৮। সন্তোষকুমার অধিকারী—বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি। প.ঃ—১৩২

আখ্যানমঞ্জরী—১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা।

বন্ধকের টাকা শোধ না দেওয়ায় মাখনবালা দাসী মামলা করেন। মামলা ওঠে বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর এজলাসে ১৯১৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। মামলায় কেউ প্রতিবাদীর তরফে উপস্থিত না থাকায় ২৮ জুন তারিখে বইগুলির গ্রন্থস্বত্ব নিলামে বিক্রী করা হয়। স্বত্ব কিনে নেন ঝামাপুকুর লেনের আশুতোষ দেব।

তিন

বোধোদয়

"The Public owes a deep debt of gratitude to Pundit Ishwar Chunder Bidyasagar for his recent publications. He has taken the first place among the educators of his countrymen"—Henry Woodrow.

বর্ণপরিচয় যদি ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান হয়, তাহলে তাঁর শিক্ষানীতির অনুযায়ী পরবর্তী সোপানগুলি নির্মাণের দায়িত্বও তাঁরই, এ কথাই বিদ্যাসাগর জেনে রেখেছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর হ্যালিডের হাতে দেওয়া বাংলা শিক্ষারীতি সম্পর্কিত নোটে তিনি উল্লেখ করেছিলেন —"মাত্র অক্ষর পরিচয় হস্তাক্ষর শিক্ষা ও সামান্য পাটিগণিতের মধ্যেই এই শিক্ষাকে সীমিত রাখা উচিত হবে না। ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী, পাটিগণিত, জ্যামিতি, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি এবং শারীরবিদ্যাও এই শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত।"

বাংলাভাষায় ছাত্রদের পাঠ্য এধরনের বই তখন ছিল না। 'পশ্বাবলী'র মতো একটি দুটি যে বই পাওয়া যেত তার ভাষা অপরিণত ও ছাত্রদের পাঠের অযোগ্য। 'পশ্বাবলী' পশুপক্ষীর বিবরণ, লেখক জন লসেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল বুক সোসাইটি স্কুলপাঠ্য বই হিসাবে এটি প্রকাশ করেন। বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনার সঙ্গে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের উপযোগী বাংলা বই প্রকাশের দায়িত্বও নিজের হাতেই নিয়েছিলেন। শিশুপাঠ্য বই হিসাবে বর্ণপরিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের পরই তাঁর 'বোধোদয়' ও 'ঋজুপাঠ'। বোধোদয়ের রচনাকাল ১৯০৭ সংবতের (১৮৫১-র এপ্রিল) চৈত্র মাস। বিজ্ঞাপনে (ভূমিকায়) তিনি লিখছেন,—

"বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল। ..... অল্পবয়সী সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি।....."

বোধোদয়ে যে সব বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, বা যেসব বিষয় বালক-বালিকাদের জানা উচিত বলে মনে করেছেন, তার মধ্যে আছে—পদার্থ, ঈশ্বর, চেতন পদার্থ, মানব জাতি, ইন্দ্রিয়, ভাষা, কাল, ধাতু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতির সঙ্গে অঙ্ক গণনা পদ্ধতিও। বোধোদয়ের ভাষা নিঃসন্দেহে বালক-বালিকাদের পাঠের উপযোগী। উদাহরণ দিই—

"ঈশ্বর কি চেতন, কি অচেতন, কি উদ্ভিদ, সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা বলে। ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ।" অথবা

"সচরাচর সকলে বলে, ত্রিশ দিনে একমাস হয়। কিন্তু সকল মাস সমান হয় না। কোনও মাস আটাশ দিনে, কোনও মাস উনত্রিশ দিনে, কোনও মাস ত্রিশ দিনে, কোনও মাস একত্রিশ দিনে, কোনও মাস বত্রিশ দিনে হয়।" বিষয় নির্বাচন ও ভাষায় সরলতায় 'বোধোদয়' আজও আদর্শ শিশু পাঠ্য পুস্তক।

'বোধোদয়'-এর পরের বই হ'ল ঋজুপাঠ—তিন ভাগে সম্পূর্ণ। প্রথম ভাগে পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি শিশুপাঠ্য উপাখ্যানের বাংলা অনুবাদ; প্রকাশকাল ১৮৫১-র নভেম্বর। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের কাহিনীগুলিকে শিশুদের উপযোগী করে পরিবেশন করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে মহাভারত, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভট্টিকাব্য, ঋতু-সংহার ও বেণীসংহার—এই কয়েকটি গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। প্রকাশ ১৮৫২ সালে। ঋজুপাঠ থেকে রামায়ণের কাহিনী পাঠ করে তাঁর মাকে শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলেন শিশু রবীন্দ্রনাথ। [জীবনস্মৃতি দ্রষ্টব্য]

ছোট ছোট কাহিনীর মধ্য দিয়ে নীতিকথা শিশুদের মনে গেঁথে

দেওয়ার জন্যেই বিশেষ করে তাঁর 'কথামালা' বইটি লেখা। ইশপ্‌স্‌ ফেব্‌ল থেকে বাছাই করা কাহিনীর সংগ্রহ কথামালায়। ১৮৫৬-র জুলাইতে লেখেন চরিতাবলী। ইতিপূর্বে (১৮৪৯ সালে) চেম্বার্সের ইংরাজী গ্রন্থ থেকে ইউরোপের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তির জীবনের কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করেছেন 'জীবন চরিত' গ্রন্থে। বিজ্ঞাপনে বলেছেন,—"কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতার্থ সম্পাদনে কৃতকার্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং কেহ বহুতর দুর্বিসহ নিগ্রহ—ভোগ করিয়াও···বিচলিত হয়েন নাই, তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এককালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৮-র মধ্যে লেখেন আখ্যানমঞ্জরীর তিনটি ভাগ। কাহিনী অবলম্বনে নীতি উপদেশ আখ্যানমঞ্জরীর বিষয়বস্তু।

ছাত্রদের পাঠের জন্যই ১৮৫৪ সালে লিখেছেন শকুন্তলা। কালিদাসের বিখ্যাত নাটকের বাংলা রূপান্তর। শকুন্তলার বাংলা ভাষা পরিণত বাংলা গদ্যের ভাষা—সুবিন্যস্ত ও সুমধুর॥

তাঁর বইগুলির মধ্যে দুটি জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এক দিকে বাংলাগদ্যের ভাষাকে সাহিত্যের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ চয়ন করে এনে বাংলায় তার স্থায়ী রূপ দিয়েছেন; অন্যদিকে বালক-বালিকাদের আধুনিক জ্ঞানের জগতে নিয়ে গিয়েছেন। তাদের চরিত্রকে দৃঢ় ভিত্তিতে বেঁধে দেওয়ার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করে পরিবেশণ করেছেন।

তাঁর আর একটি অতি উল্লেখযোগ্য কাজ প্রায়ই অনালোচিত থেকে যায়। সেটি হ'ল, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা (১৮৫১)। যখন সংস্কৃত মুগ্ধবোধ মুখস্থ করা ছাড়া সংস্কৃত শিক্ষার কোন বিকল্প পথ ছিল না, এবং মুগ্ধবোধ মুখস্থ করে মনে রাখা বাঙালী ছাত্রদের কাছে এক ঃদুসাধ্য কাজ ছিল, তখন সহজে সংস্কৃত

শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর এই বইটি লিখলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখা, সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণ শেখার কাজও প্রায় সম্পূর্ণ। বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য এই বইটি অপরিহার্য ছিল।

নিজের চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থ রচনা এবং সেই গ্রন্থগুলি যথাসময়ে মুদ্রিত করে প্রকাশ করা এক দুরূহ কাজ, বিশেষতঃ সেই যুগে, যে যুগে ছাপাখানা যত কম ছিল, প্রকাশকের সংখ্যা তার চেয়েও কম ছিল। এই বাধাকে অতিক্রম করেছিলেন তিনি নিজস্ব মুদ্রণযন্ত্র ও প্রকাশনা স্থাপন করে। তাঁর সংস্কৃত যন্ত্র ও সংস্কৃত প্রেসডিপোজিটরি থেকেই ছাপা হয়ে বেরিয়েছে তাঁর সমস্ত বই। সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে গ্রন্থগুলি, সেগুলির মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেছেন, এবং তাঁর প্রকাশনালায় থেকেই প্রকাশ করেছেন। তিনি একদিকে এঁকেছেন জনশিক্ষার ব্লুপ্রিন্ট, রচনা করেছেন উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা, অন্য দিকে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বই লিখেছেন তিনি নিজে ; এবং সেগুলিকে নিজেই ছেপে বার করেছেন। তাঁর নীতির রূপায়ণে প্রখর গ্রীষ্মের দিনে গ্রামে গ্রামে হেঁটে হেঁটেই ঘুরেছেন, গ্রামের মানুষকে বুঝিয়ে তাদের সহায়তায় স্থাপন করে গিয়েছেন একটির পর একটি বিদ্যালয়। আবার সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করেছেন, তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজ ভবনে। সরকারী সাহায্য যখন অপ্রতুল হয়েছে, তখন নেমেছেন পথে পথে ভিক্ষাভাণ্ড হাতে। শিক্ষার প্রগতিকে কোন ভাবেই থেমে থাকতে দেওয়া যায় না।

সরকারী শিক্ষাচিন্তা ও বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এদেশে শিক্ষার অবস্থা কেমন ছিল, তার কিছুটা বর্ণনা ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আমাদের দিয়েছেন। বঙ্গদেশে উচ্চশিক্ষার পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—

"টোল" চতুষ্পাঠী, মক্তব ও মাদ্রাসায় সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি শিক্ষার মধ্যেই উচ্চশিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মমূলক বিষয় ছাড়াও সাহিত্যের সঙ্গে স্মৃতি ও ন্যায় বা আইন পড়ানোর রেওয়াজ ছিল। কয়েকশ' বছর আগে ধর্মীয় নীতি ও আচার যে রক্ষণশীল মনোভাবের ভিত্তিতে প্রচার করা হত, এখনও তাই চলিত ছিল; উনিশ শতকে তার বাস্তব মূল্য যেমন ছিল না, জ্ঞানার্জনের দিক থেকেও তেমনি অর্থহীন ছিল।"[১]

স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ডঃ মজুমদার অ্যাডামের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অ্যাডাম তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবরণীতে বলেছেন—

"নারীশিক্ষার জন্যে কোথাও কোন বিদ্যালয় ছিল না। বস্তুতঃ স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গেই কারও কোন পরিচয় ছিল না। বরঞ্চ সমাজে এমন একটি সংস্কার চলিত ছিল যে, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হয়।"[২]

---

১. Dr. Ramesh Chandra Mazumdar—Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century. পৃঃ—১১

২. Dr. Ramesh Chandra Mazumdar—Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century. পৃঃ—১৩০

ছাপাখানা না থাকায় ছাপা বইও ছিল না। গুরুমশাই-রা মুখে মুখে পুরাণের গল্প শেখাতেন। দেবদেবীর স্তব ও গুরুমশায়ের মুখে শুনে ছাত্ররা মুখস্থ করত। একই ভাবে শিখত শুভঙ্করের নামতা ও অঙ্ক।

ফারসি শেখার মক্তব বা মাদ্রাসায় কোরাণ ও তার সঙ্গে সাদি ও গুলিস্তাঁ থেকে যেমন শিক্ষা দেওয়া হ'ত তেমনি শেখানো হ'ত লায়লা মজনুর গল্প।[৩]

১৮২০ সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির রিপোর্ট[৪] থেকে জানা যায়—পাঠশালাগুলিতে শিক্ষণের একমাত্র বিষয় ছিল বর্ণমালার অক্ষর ও অঙ্ক লেখা শেখানো, তার সঙ্গে সামান্য কিছু অঙ্ক। পড়ার (Reading) কোন পদ্ধতিই ছিল না। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দুর্গতি মোচনের জন্য এবং বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সে যুগে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জন ব্যক্তির নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁরা হলেন—রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড্ হেয়ার।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ ও ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালীর শিক্ষা জগতে দুটি দিগন্ত দেখা দিল।

তা সত্ত্বেও শিক্ষার নীতি নির্ধারণে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এইচ এইচ উইলসনের মতে সংস্কৃত শব্দ ও ইংরাজী চিন্তার রূপ সমন্বিত করে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দানের নীতিই প্রশস্ত।[৫] উইলিয়ম জোন্স

---

৩. Dr. Amitava Mukherjee—Reform Regeneration of Bengal পৃঃ—৫, ১১

৪. David kopf—British Orientalism and Bengal Renaissance পৃঃ—১৬০

(First report of the Calcutta School Society 1818—19)

৫. Ibid, David Kopf—British Orientalism and Bengal Renaissance পৃঃ—২৪২

(First report of the Calcutta School Society 1818—19)

থেকে শুরু করে হোরেস উইলসন পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতদের ধ্যান ও ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানালেন গভর্নর বেন্টিঙ্ক এবং তাঁর পরামর্শদাতা মেকলে। বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ থেকে ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এদেশের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। বেন্টিঙ্কের নীতিতে প্রাচ্যবিদ্যার প্রসার বাধা পেয়েছে, এশিয়াটিক সোসাইটির কাজের গতি শ্লথ হয়ে পড়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বস্তুতঃ নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে; শোচনীয় হয়ে পড়েছে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসার অবস্থা।

বেন্টিঙ্কের পরামর্শদাতা মেকলের স্ব-জাতি প্রীতি এত উগ্র ছিল যে তিনি ভাবতেন, ইংরাজ জাতি ও তার সভ্যতা শ্রেষ্ঠত্বের যে স্তরে উঠেছে, তা পৃথিবী কখনও ভাবতে পারেনি এবং পারবেও না।[৬] ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য 'poor and rude'। বেন্টিঙ্ককে তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, ভারতীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলিতে অর্থের অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হোক। ১৮৩৫ খ্রীঃ-র ৭ই মার্চ তারিখে তাঁর অফিসিয়াল রেজোলিউশনে লিপিবদ্ধ করালেন—"……all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone."[৭]

সরকারী শিক্ষানীতি ইংরাজীর অনুকূলে হওয়ায় কলকাতায় পঁচিশটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। সরকারী চাকুরিতে লোকনিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ইংরাজী জানা ব্যক্তিই এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকুরি পেতে পারত। তা ছাড়া উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার একমাত্র শর্ত ছিল ইংরাজী জ্ঞান।

---

৬. David Kopf—British Orientalism and Bengal Renaissance পৃঃ—২৫৬
(First report of the Calcutta School Society 1818—19)

৭. Resolution on Education—March 7, 1835.

এর অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ, উচ্চশিক্ষার প্রতি শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেল, কিন্তু দেশের বিস্তৃত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরক্ষরতার প্রসার ঘটতে লাগল। গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা যে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব, এ চিন্তা উপেক্ষিত হ'ল। জনশিক্ষায় বিদেশী সরকার আগ্রহীও ছিল না।

* * *

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ঠাকুরদাস পুত্রকে সংস্কৃত কলেজে দিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর ইচ্ছা ছিল, পুত্র সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে দেশে চতুষ্পাঠী খুলে বসবে। স্কুলের ছাত্র ঈশ্বরের চারপাশ দিয়ে তখন নতুন চিন্তার প্রবাহ বয়ে চলেছে। হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গল দলে তাঁর যেমন বন্ধু-বান্ধব ছিল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভাতেও তাঁর তেমনি যাওয়া-আসা ছিল। সংস্কৃত কলেজে অতিরিক্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষার সুযোগ তিনি নিজের থেকেই গ্রহণ করেছিলেন; তার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের শিক্ষকতায় তাঁর কোন অসুবিধে ঘটেনি।

একথা বিস্ময়জনক যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তরুণ শিক্ষক চব্বিশ বছর বয়সের যুবক বিদ্যাসাগর গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জকে বাংলা বিদ্যালয় খুলবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তখনই তিনি শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। সম্ভবতঃ তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ-দানের ফলেই তিনি এই ধরনের ভাবনা চিন্তার মধ্যে যেতে পেরে-ছিলেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা নিয়ে কেরী, মার্স-ম্যানের প্রতিবেদন এবং সমগ্র দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থা সম্পর্কে উইলিয়ম অ্যাডামের রিপোর্টগুলি তিনি যত্নের সঙ্গে পড়ে-ছিলেন। তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল হ্যারিংটন ও হোরেস উইলসনের শিক্ষানীতি। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে রামকমল সেনের

কাছে উইলসনের উক্তি, "Upon its (Sanskrit's) cultivation depends the means of native dialects to embody European learning and sciences."[৮] ঠিক উনিশ বছর পরে ১৮৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াট্‌কে বিদ্যাসাগর যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মধ্যে উইলসনের উপরোক্ত উক্তির প্রতিধ্বনি পাই। বিদ্যাসাগর লিখেছেন,—"Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of Sound knowledge through the medium of English…"[৯]

তার আগের চিঠিতেই লিখেছেন,—"That the students of Sanskrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt."[১০]

বিদ্যাসাগরের ওপরে উদ্ধৃত উক্তি দুটির অর্থ ঃ

"মাতৃভাষাকে পুরোপুরি আয়ত্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাকে সংস্কৃত শেখাতে দিন, তার সঙ্গে যোগ করতে দিন ইংরাজীর মাধ্যমে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাবধারাকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাকে…

"সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যে, বাংলা ভাষায় পূর্ণ অধিকার লাভ করবে, তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।"

মাতৃভাষায় শিক্ষা বিস্তারের কারণ, শিক্ষাকে গণমুখী করা। তাঁর ৮ই সেপ্টেম্বর (১৮৫৩ খ্রীঃ) এর চিঠিতেই তিনি ডঃ মোয়াট্‌কে

---

৮. David Kopf—British Orientalism…… পৃঃ—২৪২

৯. Santosh Kumar Adhikari—Vidyasagar and the Regeneration of Bengal পৃঃ—১১৩

১০. Santosh Kumar Adhikari—Vidyasagar and the Regeneration of Bengal পৃঃ—১১২

লিখেছেন—"আমরা যা চাই, তা হল শিক্ষার উপযোগিতাকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।"[১১]

শিক্ষাকে গণমুখী করার উদ্দেশ্য ছিল বলেই পাঠক্রম থেকে ধর্ম সম্পর্কিত অনুশাসন বিধিগুলি বাদ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাখতে চেয়েছেন। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করে নিজেই ছেপে প্রকাশ করেছেন। ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান 'বর্ণপরিচয়' ও 'বোধোদয়' রচনা করেছেন। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাষায় তিনি শালগ্রাম শিলা হয়েও নিজেকে বাটনা বাটার কাজে ব্যবহার করেছেন।

গ্রামে গ্রামে বাংলা বিদ্যালয় (মডেল স্কুল) স্থাপনের জন্য বিদ্যাসাগর যা করেছেন, তাও প্রায় অসম্ভব কাজ। নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী ও মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে (২১ আগস্ট ১৮৫৫—১৪ জানুয়ারি, ১৮৫৬ খ্রীঃ) কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেন।[১২]

---

১১. Santosh Kumar Adhikari—Vidyasagar and the Regenration of Bengal পৃঃ—১১১

বিদ্যাসাগরের চিঠির অংশ—"What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establsh a number of vernacalar schools, let us prepare a series of vernacular class books on useful and instructive Subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished."

১২. নদীয়া জেলার বেলঘোরিয়া, মহেশপুর, ভজনঘাট, কুশদহ ও দেবগ্রাম বর্ধমানে আমাদপুর, জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ, মানকর ও দাঁইহাট হুগলীতে হারোপ, শিয়াখালা, কৃষ্ণনগর, কামারপুকুর ও ক্ষীরপাই এবং মেদিনীপুরে গোপালনগর, বাসুদেবপুর, মালঞ্চ, প্রতাপপুর, ও জকশুরে বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়।

আর একটু আগে থেকে ধরা যাক্। ১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল তিনি প্রথম এলেন সংস্কৃত কলেজে, সহ-সম্পাদকের পদ নিয়ে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিরোধ বাধল সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে। কারণ সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা। ১৮৪৭ সালের ১৫ই জুলাই তিনি পদত্যাগ করলেন, যেহেতু কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর কোন স্বাধীনতা ছিল না। তাঁর পদত্যাগপত্রে যে কারণগুলি দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য তাঁর অসীম আগ্রহ। তিনি লিখেছেন,—"এই কাজ নেওয়ার সময় এই আশায় আমি উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম যে, এমন একটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করছি যেখানে সংস্কৃত সাহিত্যে আমার অধিকার ও সংস্কৃত কলেজের ব্যাপারে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বিশেষ ভাবে কাজে লাগবে। কিন্তু আমার সেই আশা ব্যর্থ হয়েছে।"[১৩]

শিক্ষাব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করে গড়ে তোলা, এবং সংস্কৃত কলেজকে তার ম্রিয়মাণ অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে সজীব করে তোলা ছাড়া তখনও অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। তবে ১৮৪৭ সালেই টাকা ধার করে বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যুক্তভাবে প্রেস স্থাপন করার মধ্যে ছাত্রপাঠ্য বই রচনা ও প্রকাশের উদ্দেশ্যই যে সক্রিয় ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৪৪ সালেই লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রতিষ্ঠিত বাংলা বিদ্যালয়গুলি যে, পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে কথা ভোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াতে গিয়ে বাংলা বইয়ের অভাব অনুভব করেছেন। সংস্কৃত কলেজে এক বছরের অবস্থানেও সে অভাবকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া তাগিদ এসেছে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সম্পাদক মার্শাল সাহেবের কাছ থেকেও। তাই

---

১৩. 'বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টার' থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী'তে পুরো চিঠিটা দেওয়া আছে পৃঃ—১৮

তাঁর সংস্কৃত মুদ্রণযন্ত্র থেকে তিনি ছেপে গিয়েছেন,—অন্নদামঙ্গল, বাঙ্গালার ইতিহাস, ও জীবনচরিত।

তাঁর নিজস্ব শিক্ষাচিন্তার প্রতিভূ হয়ে শিক্ষাজগতে তিনি প্রবেশ করলেন ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে।

শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াট্ ইতিমধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য, কর্মদক্ষতা ও উদ্যমী চরিত্রের পরিচয় পেয়েছেন। ১৮৫০-এর ডিসেম্বরে তিনি বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক করে তাঁকে নিয়ে এলেন ; এবং তাঁর ওপর ভার দিলেন কলেজ পুনর্গঠন ও শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার সাধনের।[১৪]

১৬ই ডিসেম্বর অর্থাৎ মাত্র দশ দিনের মধ্যে তাঁর সেই বৈপ্লবিক রিপোর্ট দাখিল করলেন তিনি। এত অল্প সময়ে সুগভীর চিন্তা প্রসূত এবং তাঁর শিক্ষাসংস্কারের ভিত্তি, এই রিপোর্ট রচনা করা কখনই সম্ভব হত না, যদি না তিনি অনেক আগে থেকেই তাঁর সুনির্দিষ্ট চিন্তাদর্শনের ব্লু প্রিণ্ট্ তাঁর মনের মধ্যে তৈরী রাখতেন।[১৫]

শিক্ষাপরিষদ তাঁর শিক্ষানীতি ও কলেজ পুনর্গঠন পরিকল্পনা পুরোপুরি মেনে নিয়ে নীতি রূপায়ণের দায়িত্ব তাঁকেই দিলেন। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সর্বক্ষমতা সম্পন্ন অধ্যক্ষের পদে বৃত হলেন।

সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন সংক্রান্ত এই রিপোর্টটিই তাঁর শিক্ষা-

---

১৪. বিদ্যাসাগরের নিয়োগ অনুমোদন করে শিক্ষাপরিষদ মন্তব্য করেন—"শিক্ষাপরিষদের মতে, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। একদিকে তিনি ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ, অন্যদিকে সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মত উদ্যমশীল, ধর্মনিপুণ, দৃঢ়চিত্ত লোক বাঙালীর মধ্যে দুর্লভ।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্য সাধক চরিতমালা—১৮) পৃঃ—২৮

১৫. বিদ্যাসাগর রচিত উল্লিখিত রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ (বিহারীলাল সরকার কৃত অনুবাদ) পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

নীতির ভিত্তিভূমি। রিপোর্টের প্রথমেই ব্যাকরণ বিভাগের কথা। কারণ শিক্ষার্থীদের প্রথম পাঁচ বছর কাটত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মুখস্থ করে। বিদ্যাসাগর সুপারিশ করলেন, ব্যাকরণের দুরূহ নিয়মগুলি বাংলা ভাষায় প্রথমে পড়ে নিতে হবে। সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগের আলোচনায় বললেন—সংস্কৃত রচনার সঙ্গে ছাত্রদের বাংলা রচনাতেও অভ্যস্ত হতে হবে। গণিত বিভাগের আলোচনায় তাঁর মন্তব্য—I would propose that a popular treatise on Astronomy, such as Herschel's, be compiled in Bengali……I beg leave to propose that the study of Bengali books treating on useful and entertaining subjects be introduced.…"

সংক্ষেপে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল বাংলা ভাষা। তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সুপারিশ হল স্মৃতি বা আইন বিভাগে। রঘুনন্দনের অষ্টবিংশতি তত্ত্ব তখন পাঠ্য রয়েছে। হিন্দুসমাজে স্মার্ত রঘুনন্দন অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় নাম। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন,—"With the exception of Daya and Vyavahara tattwas,……the other 26 tattwas are treatises on the forms of religious ceremonies……the study of the tattwas ought to be discontinued."

অর্থাৎ অষ্টবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে ছাব্বিশটিই ধর্মানুষ্ঠান সংক্রান্ত বিধি এবং পুরোহিত শ্রেণীর ব্যবহার যোগ্য। কাজেই ওই বইটি আর পড়ানো চলবে না।

দর্শন শ্রেণীতেও রঘুনাথ শিরোমণির অনুমান দিধিতি ও অন্য তিনখানি বাদ দিয়ে তিনি যুক্ত করলেন সাংখ্য প্রবচন, পতঞ্জলি সূত্র প্রভৃতি বইগুলি। মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু দর্শন চিন্তা একেবারেই মেলে না। তবু সংস্কৃতজ্ঞ ও হিন্দু চিন্তাধারায় অগ্রণী হতে গেলে ঐ দর্শন

শাস্ত্রগুলি পড়তেই হবে। তবে একই সঙ্গে তাদের ইংরাজী শিখতে হবে ; ইংরাজী ভাষায় পড়তে হবে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন ; যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের দেশের দর্শন চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের নব্য চিন্তার তুলনামূলক আলোচনায় বসতে পারে।

এই রিপোর্টেই তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। কেন, তার বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর ৭ই সেপ্টেম্বর ও ৫ই অক্টোবর তারিখে লেখা দুটি চিঠিতে।

তার আগে ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে বসে বিদ্যাসাগর আর একটি যে নোট তৈরী করেছিলেন, সেই নোটটি পড়ে দেখা যাক। নোটটি ইংরাজীতে রচিত। বাংলা অনুবাদ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগর' বই থেকে নেওয়া।

"বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব যাঁদের ওপর ন্যস্ত, তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, উন্নত বাংলাসাহিত্য সৃষ্টি করা।

"যাঁরা ইউরোপীয় উপকরণ সংগ্রহ করেও, উন্নত ভাব প্রকাশ-ক্ষম বাক্‌রীতিসম্পন্ন বাংলাভাষায় তা' প্রকাশ করতে অক্ষম, তাঁদের দ্বারা এমন কোন সাহিত্য রচিত হতে পারে না।

"যাঁরা সংস্কৃত ভালো জানেন না, তাঁদের পক্ষে ভাব প্রকাশের উপযুক্ত বাংলাভাষা রচনার বাকরীতিসম্মত শৈলী আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, আর সেইজন্যই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সুপরিচিত করানোর প্রয়োজন ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে।

"অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, শুধু ইংরাজী জানা পণ্ডিতদের পক্ষে তাঁদের চিন্তা ও ভাবনা, উন্নত বাক্ রীতি সম্পন্ন বাংলাভাষায় প্রকাশ করা মোটেই সম্ভব নয়।

"কাজেই এ কথা পরিষ্কার করে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের দক্ষ ও সার্থক স্রষ্টা হতে হলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের পরিচয় ঘটাতে হবে।"

তাঁর এই ক্ষুদ্র মন্তব্য থেকেই এ'কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার উন্নয়ন এবং বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টি। সেইজন্যই অর্থাৎ বাংলাভাষার শব্দ-ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যময় করে তুলতে ও সাহিত্যকে ভাবময় করতেই তিনি সংস্কৃত ও ইংরাজী দুটি ভাষার চর্চাই অব্যাহত রাখতে চেয়েছেন।

এরপরে মনে এই প্রশ্ন জাগাই স্বাভাবিক যে, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা নিয়ে ভাবনা চিন্তা কি শুধু বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন প্রয়াসেই সীমাবদ্ধ ছিল? অথবা আরও গভীর দূরপ্রসারী ও বৈপ্লবিক কোন লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

ডঃ মোয়াট্‌কে লেখা চিঠিতে তাঁর মূল উদ্দেশ্যের কিছুটা বুঝি খুঁজে পাওয়া যায়। কলেজ পুনর্গঠন সম্পর্কিত রিপোর্টেও কিছুটা আভাস ছিল। ইংরাজী শিক্ষাকে আবশ্যিক করার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—"They shall have an ample opportunity of comparing the systems of philosophy of their own with the new philosophy of the Western world. Young men thus educated will be better able to expose the errors of ancient Hindu Philosophy."

হিন্দু দর্শন কিম্বা তার কিছু বিকৃতি যে হিন্দুসমাজের চরম ক্ষতি করেছে, এ'সম্বন্ধে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। বেদান্তের মায়াবাদ (শঙ্করাচার্যকৃত ব্যাখ্যা) সমাজের মানুষের কাছে ইহজগৎকে মূল্যহীন করে তুলেছে। পারলৌকিক জীবনের আকর্ষণে মানুষের ধ্যান ধারণা ও কর্মোদ্যোগ শুধু ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। পুরোহিতশ্রেণীই ধর্মের একমাত্র ব্যাখ্যা তা হওয়ায় সাধারণ মানুষ সামাজিক অনুশাসন ও প্রথা এবং দেশাচারের হাতে বন্দী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অশিক্ষার ও আচারের শৃঙ্খলে বন্দী

হিন্দুসমাজ অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে উদ্ধৃত করে বলতে পারি—

"A deep rooted belief in a number of gods and goddesses and worship of their images, the caste system, restrictions of food and marriage, strict prohibition of marriage of widows, horror of beef eating etc……

"The 'Sati' or burning of the widows along with their dead husbands, throwing children into the Ganges, horrible tortures self inflicted during the Charak Puja and the pathetic tales of woes and sufferings of the Kulin girls left the society unmoved. It seems as if there was a paralysis of moral sensibilities and utter lack of human feelings among the Hindus."[১৬]

রামমোহন রায়ও বিচলিত হয়েছিলেন এই শোচনীয় সামাজিক অবক্ষয়ে। পশ্চিমের বিজ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষার ধারাকে তিনিও আবাহন জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র অধিকার করেছিল ধর্মসংস্কার এবং ধর্মের মৌলিকতা নিয়ে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে বাদানুবাদ। রামমোহন হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থিতি পাননি, তাই দেশাচারের এই বিপুল শ্যাওলার স্তূপ সরাবার মতো সক্রিয় কর্মসূচী তিনি তৈরী করতে পারেননি।

হয়ত রামমোহনের অভিজ্ঞতা তাঁকে সতর্ক করেছিল। ডিরোজিয়ানদের মতো বিদ্যাসাগর কোনদিনই হিন্দুসমাজের নিন্দায় রত হননি। প্রচণ্ড ঘৃণার বিষ বুকে চেপে রেখে তিনি পথ তৈরী করেছেন, যে পথ দিয়ে সমাজ মানবিকতার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে।

---

১৬. Dr. Ramesh Chandra Mazumdar—Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century পৃঃ—১৪—১৫

সমাজের মানুষের প্রতি, অন্ধবিশ্বাসে ও সংস্কারে আচ্ছন্ন পণ্ডিতদের প্রতি, তাঁর যে কি বিপুল ঘৃণা ছিল, তার পরিচয় মেলে ডঃ মোয়াট্‌কে লেখা আলোচ্য চিঠিটি থেকে। "The bigotry of the learned of India, I am ashamed to state, is not in the least inferior to that of the Arab."[১৭] এই পণ্ডিতমন্য নির্বোধ ও ধর্মান্ধ মানুষগুলির সঙ্গে বিজ্ঞান চিন্তার সমন্বয় ঘটানো অসম্ভব। "It appears to me to be a hopeless task to conciliate the learned of India to the acceptance of the advancing Science of Europe."[১৮]

তাঁর উদ্দেশ্যকে আর একটু স্পষ্ট করেছেন ঐ একই চিঠিতে যখন তিনি বলছেন,—মাতৃভাষায় পূর্ণ অধিকার, প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের জ্ঞান, এবং দেশের কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি,—শিক্ষকদের এই গুণগুলি থাকা চাই। বিদ্যাসাগর মনে করতেন শিক্ষার আলোকে মানুষের অন্ধতার মোচন হয়, তার দীর্ঘকালের সংস্কারের শিকড়গুলি ক্ষয়ে যায়। কিন্তু সে শিক্ষা আধুনিক হওয়া চাই। বিশ্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও মানবিক চিন্তাধারার সঙ্গে তার যোগ থাকা চাই।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, সরকারী নীতির সঙ্কীর্ণতায় এতদিন ইংরাজীই প্রাধান্য পেয়েছে; এবং শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্তরা বিত্তশালী পরিবারের মানুষ উচ্চশিক্ষা ও ইংরাজীয়ানার দিকে বেশী আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে শিক্ষার জগতে প্রবেশ সম্ভব হয়নি। বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে বাংলাভাষা, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক গড়ার দিকে জোর দিয়েছেন, কারণ তাঁর চিন্তা.

---

১৭. Santosh Kumar Adhikari—Vidyasagar and the Regeneration of Bengal পৃঃ—১১০

১৮. Santosh Kumar Adhlikari—Vidyasagar and the Regeneration of Bengal. পৃঃ—১১০

শিক্ষা হবে গণমুখী। পূর্বে উল্লিখিত চিঠিতে ডঃ মোয়াট্‌কে তিনি বলেছেন,—"What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people." তার আগেই আবার একই কথা—"The natives of Bengal appear to be very eager to receive the benefit of education." বাংলার অধিবাসীরা শিক্ষার সুফল ভোগ করতে আগ্রহী বলেই মনে হয়। আমরা যা করতে চাই, তা হল, শিক্ষার সুফলকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সাধারণ মানুষ যদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তাহলে তাদের মধ্যে দেশাচার থেকে মুক্ত হবার প্রবণতা দেখা যাবে।

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, তাঁর লক্ষ্য সমাজের বিস্তৃত ভূ-ভাগের দিকে। তিনি চান সামাজিক রূপান্তর ঘটাতে। শিক্ষাই তাঁর প্রধান অস্ত্র বা হাতিয়ার।

হিন্দু সমাজ যে শুধু সংস্কারে জীর্ণ তাই নয়, বৈষম্যেও জীর্ণ। এই বৈষম্য হল প্রথমতঃ জাতি বা বর্ণবৈষম্য এবং দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী ও পুরুষের বৈষম্য। বিদ্যাসাগর নিজে জাতিবৈষম্য মানতেন না, সংস্কৃত কলেজ থেকেও জাতিভেদ তিনি তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রয়াসকে যে কাজে সংহত করেছিলেন, তা হল স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের অবসান ঘটানো। 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা···' পুস্তকে তিনি বলেছেন,— "স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন।···প্রভুতাপন্ন পুরুষজাতি যদৃচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন।" সমাজ সংস্কারে বিদ্যাসাগর বেছে নিয়েছিলেন এই লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত ও অসহায় নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করার ক্ষেত্র। বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ রহিত করার জন্য যেমন তিনি সমাজকে সচেতন করতে চেষ্টা করেছেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে

তেমনি নারীজাতিকে জাগ্রত ও শক্তিময়ী করে তুলতে চেয়েছেন। বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বা বহুবিবাহ রোধে একদিকে যেমন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে শাস্ত্র সম্বন্ধে সজাগ করতে চেয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষাদর্শন ও মানবিকতার মূল্য-বোধ সমাজের দেহে গ্রথিত করতে চেয়েছেন।

কাজেই শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ চাই এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছোনো চাই। এই দুটি কাজই সম্ভব, শিক্ষার মাধ্যম যদি মাতৃভাষা হয়, অন্ততঃ প্রাথমিক স্তরে।

১৮৫৪ কালে শিক্ষাপরিষদের সদস্য এফ. জে. হ্যালিডের (পরবর্তী কালে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার গভর্নর) অনুরোধে বিদ্যাসাগর বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে নোট তৈরী করেছিলেন, তাতেও তাঁর মন্তব্য—"সুবিস্তৃত এবং সুব্যবস্থিত বাংলা শিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কেননা, সর্বত্র ইহারই সাহায্যে জনসাধারণের উন্নতি ও শ্রীবর্ধন সম্ভবপর।"

ওই নোটে তিনি দক্ষিণ বঙ্গের চারটি জেলায় অন্ততঃ পঁচিশটি মডেল স্কুল খোলার পরামর্শ দেন। ঐ স্কুলগুলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের হাতে থাকবে। তিনি আরও প্রস্তাব দেন যে, এইসব স্কুলের জন্য শিক্ষক তৈরী করতে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। ঐ নর্মাল স্কুল সংস্কৃত কলেজেই বসবে।

বিদ্যাসাগরের এই বিস্তৃত সুবিন্যস্ত নোটটি অনুমোদন করে বাংলার গভর্নর হ্যালিডে বড়লাটের কাছে পাঠান। হ্যালিডে এই স্কুলগুলি তত্ত্বাবধানের পুরো দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন।

হ্যালিডে যখন বাংলায় বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বাংলা শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারের জন্য, বিদ্যাসাগরের রচিত পরিকল্পনাটি বড়লাটের কাছে গ্রাহ্য করাতে চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই (জুলাই ১৮৫৪ খ্রীঃ) লণ্ডন, বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি চার্লস্ উড্-এর

কাছ থেকে ভারত সরকারের কাছে শিক্ষা সম্পর্কে একটি নির্দেশনামা এসে পৌঁছেছিল ; ঐ নির্দেশনামাতে এদেশে জাতীয়-স্তরে শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল। উডের পরিকল্পনাতেও প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় ও উচ্চশিক্ষা ইংরাজীতে দেওয়ার নির্দেশ, এবং গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের ও বেসরকারী উদ্যোগকে সহায়তা দানের কথা ছিল। উডের নির্দেশনামা অনুসারে শিক্ষাপরিষদের বদলে ডি পি আই বা শিক্ষা অধিকর্তার নিয়োগ, এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার নির্দেশ ছিল।

নতুন ব্যবস্থার মধ্যেও দক্ষিণ বাংলার নির্দিষ্ট জেলাগুলিতে বাংলা মডেল স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শনের দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তির হাতেই থাকা উচিত, এই ছিল ছোটলাট হ্যালিডের সুপারিশ। হ্যালিডের সুপারিশ অনুযায়ী ১ মে, ১৮৫৫ সালে তাঁকে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করা হল। এই অতিরিক্ত দায়িত্বের জন্য তাঁকে অতিরিক্ত বেতনও দেওয়া হল—দু'শ টাকা অর্থাৎ তাঁর মোট বেতন হল (৩০০+২০০) পাঁচশ টাকা।

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর অনুভব করলেন যে, মডেল স্কুলে নিয়োগের জন্য যে শিক্ষকদের নেওয়া হবে, তাদেরও শিক্ষণব্যবস্থা থাকা দরকার। কাজেই সেই প্রস্তাব দিলেন তিনি। আর ১৮৫৫ সালের জুলাই মাসে তাঁর তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত কলেজ ভবনেই একটি নর্মাল স্কুল খোলা হল। প্রধান শিক্ষক হলেন তাঁরই মনোনীত ব্যক্তি অক্ষয়কুমার দত্ত।

শিক্ষা বিস্তার

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি কর্মব্যস্ত মানুষ। তার মধ্যে লিখে চলেছেন ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তক। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁর শকুন্তলা পাঠ্য পুস্তক হিসাবে লিখিত হলেও বাংলা

গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসেও একটি উল্লেখ্য গ্রন্থ। ১৮৫৫ সালের মধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছে বর্ণপরিচয় (১৩ই এপ্রিল) প্রথম ভাগ ও (১৪ই জুনে) দ্বিতীয় ভাগ। একই সঙ্গে তিনি সমাজ সংস্কারের কাজেও ব্যস্ত। বিধবাবিবাহ প্রবর্তন ও বহুবিবাহ রহিত করার আন্দোলন তুলেছেন। বহন করছেন স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের (বেথুন স্কুল) দায়িত্ব। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় তারই মধ্যে স্থাপন করলেন, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া ও বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে কুড়িটি বাংলা বিদ্যালয়।

শিক্ষা অধিকর্তার কাছে পাঠানো তাঁর একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, যে, সংস্কৃত কলেজে গরমের ছুটি হলে, সেই দারুণ গ্রীষ্মের রোদে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন, সম্ভবত পায়ে হেঁটেই। তাঁর দেওয়া রিপোর্টে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, কলকাতা থেকে ২১ মাইল দূরে শিয়াখালা (২১ মে তারিখে), পরের দিনই কলকাতার ৪০ মাইল পশ্চিমে রাধানগর ও কৃষ্ণনগর গ্রামে, ২৪ মে তারিখে ৬০ মাইল দূরবর্তী ক্ষীরপয় শহরে, সেখান থেকে চন্দ্রকোণায় গিয়েছেন। তিনি গিয়েছেন কামারপুকুরে, মায়াপুরে, মলয়পুরে। গিয়েছেন নদীয়া, বর্ধমান ও ২৪ পরগণাতেও। গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাদের যোগাযোগে ব্যবস্থা করেছেন কুড়িটি মডেল স্কুল খোলার।[১৯]

স্ত্রীশিক্ষা

শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রকে তিনি নারীসমাজেও বিস্তৃত করেছেন। বস্তুতঃ নারীশিক্ষার জন্য উনিশ শতকের প্রথম থেকে নানা চেষ্টা চলেছে। গোঁড়া হিন্দু হয়েও রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। বেথুন ও বিদ্যাসাগরের যুগ্ম

---

১৯. উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর (বাংলা স্কুলের পরিদর্শকের রিপোর্ট) পৃঃ—৩৩

প্রচেষ্টাতেই (১৮৪৯ খ্রী:) হিন্দু ফিমেল স্কুল (পরবর্তী কালে বেথুন স্কুল) স্থাপিত হয়। স্কুল স্থাপন করা মানেই স্কুল চালু হয়ে গেল, তা নয়। স্ত্রীশিক্ষা তখন সমাজের অনুমোদন পায়নি। কোন ভদ্রঘরের মেয়ে প্রকাশ্য স্থানে বিদ্যালয়ে আসবেনা। এমন অবস্থার মধ্যে শাস্ত্র বাক্য উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর রক্ষণশীলতার প্রাকার ভাঙ্‌লেন। তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

অভিজাত হিন্দু ঘরের মেয়েরা না এলে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের চেষ্টায় ঐ বিদ্যালয়ে মদনমোহনের দুই কন্যা ছাড়াও রামগোপাল ঘোষ, ঈশানচন্দ্র বসু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কন্যারাও এসে যোগ দিল। যে গাড়ীতে বালিকাদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হত তার দুই পাশে বিদ্যাসাগর মনুসংহিতার একটি বচন লিখে দিয়েছিলেন নিজের হাতে—

কন্যাপেয়ং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ [২০]

১৮৫১ সালে বেথুন সায়েবের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় এই বিদ্যালয়ের ভার সরকার গ্রহণ করল। বিডন উদ্যোক্তা হয়ে এই বিদ্যলয়কে সমাজে গ্রহণ যোগ্য করানোর উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিচালন কমিটি গঠন করলেন ; বিদ্যাসাগর তার সম্পাদক।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সম্পাদক হিসাবে বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলের তত্ত্বাবধানে ছিলেন।

বলা বাহুল্য যে বিদ্যাসাগরের প্রবল উদ্যম না থাক্‌লে হিন্দু ফিমেল স্কুল (বা বেথুন স্কুল) কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। রক্ষণশীল সমাজের প্রতিভু হয়েও রাজা রাধাকান্ত দেব ইতিপূর্বে

---

২০. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত (বুকল্যাণ্ড্ সংস্করণ) পৃঃ—৮৪

এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করায় ইংরাজ মিশনারীদের যে কোন কাজকেই দেশের লোক সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছিল। ইতিপূর্বে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে কোন ভদ্রঘরের হিন্দু-বালিকা তাই আসতো না।

শিক্ষাবিস্তারের নীতিতে নারীসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা বিদ্যাসাগরের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ নারীর প্রতি পুরুষ ও সমাজের নিপীড়ণ বন্ধ করতে হলে শিক্ষাকে সর্বস্তরেই ছড়াতে হবে। সমাজকে সংস্কার ও দেশাচার থেকে মুক্ত করতে হলে নারী সমাজকেও সংস্কারমুক্ত করতে হবে। শিক্ষার প্রসার না ঘটালে নারী চেতনাকে আত্মনির্ভরশীল করা সম্ভব নয়

উড্ সাহেবের শিক্ষাসম্পর্কিত নির্দেশনামাতেও স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের নির্দেশ ছিল। গভর্নর হ্যালিডেও বিদ্যাসাগরকে সমর্থন জানালেন। তাঁর কাছে মৌখিক অনুমোদন লাভ করেই কাজে হাত দিলেন বিদ্যাসাগর। পূর্বে উল্লিখিত চারটি জেলার শহরে গ্রামে ছুট্‌তে লাগলেন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগে। মডেল স্কুল স্থাপন করার চেয়ে অনেক বেশী শক্ত কাজ সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করা। কিন্তু অসম্ভব কর্মতৎপরতা; মাত্র ছ মাসে, ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-র মে মাসের মধ্যে ৩৫টি গ্রামে তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। সে যুগে যে কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব ছিল একাজ; কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে ছিলেন বিদ্যাসাগর।

হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও নদীয়া জেলায় বিদ্যাসাগর যে বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন সেগুলি হল—

পোটরা, দাসপুর, বঁইচি, দিগশুই, তালাণ্ডু, হাতিনা, হয়েরা, নপাড়া, উদয়রাজপুর, রামজীবনপুর, আতাব্‌পুর, শিয়াখালা,

মাহেশ, বীরসিংহ, গোয়ালসারা, দণ্ডীপুর, দেপুর, রাউজাপুর, মলয়পুর, বিষ্ণুদাসপুর, রাণাপাড়া, জামুই, শ্রীকৃষ্ণপুর, রাজারামপুর, জ্যোৎ শ্রীরামপুর, দাঁইহাট, কাশীপুর, সামুই, রসলপুর, বস্তীর, বেলগাছি, ভাঙ্গাবন্ধ, বদনগঞ্জ, শান্তিপুর এবং নদীয়া।

যদিও আমরা ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলেছি, কিন্তু পরবর্তী বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ৪০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৫৭—৫৮ সালে তাঁর রিপোর্টে বিদ্যাসাগর লিখেছেন—[অরবিন্দ গুহর আনপাবলিশ্‌ড্‌ লেটার্স অব বিদ্যাসাগর দ্রষ্টব্য]

"মডেল স্কুলগুলি চালু করে দেওয়ার পরেই আমার সমস্ত শক্তিকে নিযুক্ত করলাম, আমার অধীনে যে জেলাগুলি আছে, সেই সব জেলাতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করার ব্যাপারে। বিগত শিক্ষাবর্ষে এবং গত মে ও জুন মাসে আমি চল্লিশটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে পেরেছি। এই বিদ্যালয়গুলির মোট ছাত্রী সংখ্যা ১৩৪৮। অন্তর্বর্তী গ্রাম ও শহরের অধিবাসীরা তাদের মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে কিছুতেই সম্মত হবে না, এই ধারণায় কিছু ব্যক্তি আমাকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করেছে। আমি তবু ঐ কথাই ভেবেছিলাম যে, আন্তরিক প্রয়াস থাকলেই সাফল্য আসবেই। আমার ধারণা অনুযায়ী আমি কাজ আরম্ভ করলাম এবং এখন আমি খুশি হয়ে বলতে পারছি যে, আমি যে শুধু সাধারণের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি পেয়েছি, তাই নয়, সকলে কাজে এগিয়ে এসেছে এবং তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়েছে।...

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, সরকারী নীতি প্রতিকূল না হলে আমি নদীয়া ব্যতীত আমার অধীনস্থ বাকী জেলাগুলির প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারবো। কাজেই একথা

বলা যেতে পারে যে সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে মানুষের চেতনাতে ও পরিবর্তনের দোলা লেগেছে। বঙ্গদেশের শিক্ষার ইতিহাসে নবযুগ সৃষ্টির হতে চলেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।"

বাংলার গভর্নর হ্যালিডে তাঁর ১৯-১১-১৮৫৮ তারিখের নোটে বিদ্যাসাগরের এই অসামান্য সাফল্যকে স্বীকার করে লিখলেন,—

—The instance given by Mr. Young of the 1870 girls recently sent to school at the simple will and pleasure of the rural papulation of about forty villages···is but one of several cases that could be produced to prove the change of feeling which has taken place···

তবু তাঁর সাফল্য এল না। শিক্ষানীতির রূপায়ণে বাধা পেলেন সরকারী দপ্তর থেকেই যেখান থেকে সবচেয়ে বেশী সহায়তা এতকাল পেয়েছেন।

ডি পি আই বা শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং তাঁকে সেই স্বাধীনতা দিতে রাজি হলেন না, যা তিনি এতকাল ভোগ করেছেন। প্রশাসনিক প্রয়োজনে সংস্কৃত কলেজের গুরুত্বকেও খর্ব করা হল। ১৮৫৭ সালের আগষ্ট মাসে ভলান্টিয়ার বাহিনীকে (ইংরাজ সৈন্য) থাকতে দিতে তাঁকে কলেজ ভবন ছেড়ে দিতে হল। গর্ডন ইয়ংকে ১লা আগষ্ট একটি চিঠি লিখলেন তিনি—[২১]

It will be seen from Mr Sutcliff's letter that the college and schools have been closed at the desire of Colonel Strachey, Commandant of the Volunteer Corps, a body of whom are to be located in the college premises···"

আর একটি চিঠিতে (Letter No 1155 dt. 2.9.1857) লিখলেন,—[২২]

---

২১. Arabinda Guha—Unpublished Letters পৃঃ—১১৬

২২. Arabinda Guha—Unpublished Letters পৃঃ—১১৯

".....I have the honour to state that at 2. o' clock in the afternoon of yesterday, I received a letter from the Principal of the Presidency College forwarding a communication to his address from the Garrison Engineer requesting him to vacate the College premises without delay."

পরবর্তী চিঠি ৯ই সেপ্টেম্বরে (Letter No 427,[২৩] বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী C.E. Buckland ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেণ্ট্‌কে লিখছেন,—সংস্কৃত কলেজের জন্য ৩০ ও ৭৫ টাকা ভাড়ায় দুটি বাড়ী নেওয়ার যে প্রস্তাব শিক্ষা অধিকর্তা ইয়ং দিয়েছেন, সে প্রস্তাবটি মঞ্জুর করা হোক্। সমর দপ্তরের আদেশে সেনাবাহিনীর জন্য সরকারীভবন যতদিন অধিকৃত থাক্‌বে ততদিন (সংস্কৃত কলেজের জন্য) ঐ বাড়ী দুটি ভাড়া নেওয়া হবে।"

৩১ আগষ্ট (১৮৫৭ খ্রীঃ) বিদ্যাসাগর একটি চিঠি দিলেন গভর্নর হ্যালিডেকে—[২৪]

"কিছুকাল আগে শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনার সময় এই প্রদেশে বাংলাভাষায় শিক্ষাদান ও শিক্ষার প্রসার নতুন ব্যবস্থায় কেমন চলছে, তা আপনাকে জানাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি অনিচ্ছায় হলেও আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলবো বলে কথা দিয়েছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, কাজটি আমার পক্ষে অসুবিধাজনক, কারণ কিছু বলতে গেলে আমায় সমস্তরের অফিসারদের বিরুদ্ধেই বলতে হবে। কাজেই আমার এই অক্ষমতার জন্য মার্জনা চাচ্ছি।

আপনাকে এখন জানাতে চাই যে, সামনের জানুয়ারিতে আমি

---

২৩. Arabinda Guha—Unpublished Letters পৃঃ—১৮১

২৪. Subal Chandra Mitra—Iswar Chandra Vidyasagar পৃঃ—৩৩ ৫

সরকারী চাকুরি থেকে বিদায় নেব বলে স্থির করেছি। আমার এই ইচ্ছার কথা মিঃ ইয়ংকেও আমি জানিয়েছি।"

এই চিঠি থেকে সুস্পষ্ট যে সরকারী দপ্তরের লালফিতা যুক্ত ফাইলের নাড়াচড়া যেমন তাঁর পছন্দ নয়, বাংলাভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্তমান ব্যবস্থাও তিনি তেমনি মেনে নিতে পারেন নি। ১৮৫৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আগের চিঠির এক বছর পরে হ্যালিডেকে তিনি যে চিঠি দিলেন, তার ভাষা তুলনায় বেশী রূঢ় ও স্পষ্ট। বিদ্যাসাগর বললেন,—[২৫]

"আমি আপনাকে বহুবার জানাইয়াছি যে বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে কর্ম করা আমার পক্ষে নিতান্ত অপ্রীতিকর ও ক্লেশদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ বহু অর্থব্যয় করিয়া যে প্রণালীতে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, সে পদ্ধতির প্রতি আমার কোনো প্রকার সহানুভূতি নাই। আপনি অবগত আছেন যে, আমি সর্বদাই আমার কর্তব্যের পথে বাধা পাইয়াছি।"

একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিদ্যাসাগর পুরোপুরি হতাশ হয়েছেন। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন এবং বাংলাভাষায় শিক্ষা বিস্তারের যে পথে তিনি এগোতে চেয়েছিলেন, তা আর সম্ভব নয়। সরকারী নীতিই তার প্রতিবন্ধক।

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারত সরকার ব্যয়-সঙ্কোচনীতি গ্রহণ করলেন এবং বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে অর্থ সাহায্য দিতে অস্বীকার করলেন। বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই যে টাকা খরচ করেছিলেন, সেই টাকাটাই শুধু মঞ্জুর করা হল। বিদ্যাসাগরের স্থাপন করা ৪০টি বিদ্যালয়ের খরচ চালাতে সরকার রাজি হল না। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে

---

২৫. 'বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টার' প্রকাশিত 'বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী'। পৃঃ—৩৫

শিক্ষা অধিকর্তাকে দেওয়া স্কুল পরিদর্শক উড্রোর রিপোর্টে থেকেই সরকারী মনোভাব এবং বিদ্যাসাগরের অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তাঁর রিপোর্টে উড্রো লিখেছেন,—

"বর্তমানে চলিত আইন অনুসারে বঙ্গদেশে বিদ্যালয় সমূহের কোন পরিদর্শক যদি দেশীয় বালিকাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় আগ্রহী হন, তবে বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ তাঁকেই বহন করতে হবে আমার মনের ইচ্ছা আমি সতর্ক হয়ে দমন করেছি। কিন্তু পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইতিমধ্যেই চল্লিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এই বিদ্যালয়গুলিতে উচ্চবর্ণের তেরশ'রও বেশী বালিকা উপস্থিত হচ্ছে। কাজেই পণ্ডিত এই বিদ্যালয়গুলির ব্যয় বাবদ তিন থেকে চার হাজার টাকার মতো অর্থে দায়বদ্ধ।

[General Report on Public Instruction etc. for 1857-58]

শিক্ষক অধিকর্তা ইয়ংয়ের নোট :—

"Special aid solicited to a number of female Schools got up by Pandit Ishwar Chander Sarma. Aid refused by Supreme Government....."

কাজেই বিদ্যাসাগরের পক্ষে এখন নিছক চাকরি করা ছাড়া তাঁর নীতি রূপায়ণের কাজে আর কিছু করার ছিল না। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি চাকরি থেকে বিদায় নিলেন।

শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভাবে স্ত্রীশিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারী নীতির সঙ্কোচ ও কার্পণ্য বিদ্যাসাগরকে নিশ্চয়ই বিমর্ষ ও ব্যথিত করেছে। কিন্তু হতোদ্যম তিনি হন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতেই তুলে নিয়েছেন। তিনি নারী শিক্ষার জন্য আলাদা একটি অর্থভাণ্ডার খুলেছিলেন, যাতে বিভিন্ন ব্যক্তি মাসিক চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গিয়েছে, দু' চার মাস দেওয়ার পর সকলেই

পিছিয়ে গিয়েছেন। সেসিল বিডন, রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রমুখ কয়েকজন কিছু কিছু চাঁদা দিয়েছেন। কিন্তু ব্যয়ভারের বিপুল অংশটা তাঁকেই বহন করতে হয়েছে।

বই বিক্রির টাকা থেকে এই সময়ে তাঁর মাসিক আয় ছিল চারহাজার টাকার মতো। কিন্তু ব্যয় ছিল তার চেয়েও বেশী। তাঁর বীরসিংহের বাড়ীর খরচ, কলকাতার বাসা খরচ, ছাত্রদের জন্য মাসিক অনুদান, দুঃস্থ ব্যক্তি এবং অসহায় বিধবাদের মাসোহারা, —এ'র ওপরে ছিল বিধবা-বিবাহ জনিত ব্যয় এবং বালিকাবিদ্যালয়-গুলির ব্যয়ভার। অর্থের প্রয়োজন তাঁকে মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তুলেছে। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের কাজে অর্থব্যয়ে তাঁর কোন কুণ্ঠা ছিল না। তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত ও অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির সাফল্যের জন্য। ১৮৬৩ সালের ১১ই অক্টোবর তারিখে স্যর বার্ট্ল ফ্রিয়ারকে লেখা একটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করছি এ বিষয়ে তাঁর নিষ্ঠা ও প্রয়াসের পরিচয় দিতে—

"You will no doubt be glad to hear that the Mufussil Female Schools, to the support of which you so kindly contributed, are progressing satisfactorily. Female education has begun to be gradually appreciated by the people of districts contignous to Calcutta and schools are being opened from time to time "[২৬]

১৮৮৫ সালে বেথুন স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভায় একটি মেধাবী ছাত্রীকে তিনি আনন্দে সোনার হার উপহার দেন। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা প্রথম বাঙালী নারী চন্দ্রমুখী বসুকে তিনি সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী এক প্রস্থ উপহার দিয়ে লেখেন,—
"To Smt Kumari Chandramukhi Basu, the first Bengali lady, who has obtained the degree ol Master of Arts·····'

---

২৬. Subal Chandra Mitra. পৃঃ—৪১৯—২০

বেথুন স্কুলকে আদর্শ বালিকাবিদ্যালয় রূপে গড়ে তুলতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। ১৮৫৬ সালে স্কুলটি সরকারী পরিচালনায় চলে যাওয়ার নতুন কমিটিতে তিনিই অবৈতনিক সম্পাদক হন। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর সম্পাদক হিসাবে বিদ্যাসাগর বাংলা সরকারকে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তাতে তিনি লেখেন—[২৭]

"পঠন ও লিখন, পাটিগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানাবিষয়ে মৌখিক পাঠ, এবং সূচীকার্য শিক্ষণীয় বিষয়। বাংলাভাষার মধ্য দিয়াই ছাত্রীগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়।...

"কমিটির মত এই যে, ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ হইতে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা দেখিয়া কমিটি বিশ্বাস করেন, যাহাদের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, সমাজের সেই শ্রেণীর লোকের কাছে ইহা ক্রমেই সমাদর লাভ করিতেছে। বড় লোকেরা এখনও সাক্ষাৎভাবে বেথুন বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হন নাই, এই শ্রেণী হইতে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রীই স্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।"

বেথুন স্কুলকে কেন্দ্র করে কলকাতা ও কাছাকাছির শহরগুলিতে নারী শিক্ষার ব্যবস্থাকে গড়ে তুলবেন, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা তাঁর পূর্ণ হয়নি। তাঁর নিজের হাতে গড়ে তোলা বেথুন স্কুল থেকেও তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল, সেই একই কারণে; সরকারী নীতির সঙ্গে তার উদ্দেশ্য ও নীতির মিলন ঘটেনি বলে।

১৮৬৬ সালে লণ্ডন থেকে শিক্ষাব্রতী মিস্ মেরী কার্পেন্টার এ দেশে এসেছিলেন, এখানকার নারী শিক্ষার অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে।

উল্লেখ করা উচিত যে, শিক্ষাব্রতী হিসাবে, এবং ভারতবর্ষে নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসাবে বিদ্যাসাগরের নাম ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর পণ্ডিত মহলে তখন সুপরিচিত। জেসেল স্যাফ্‌ট্ থেকে প্রকাশিত জার্মান পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে

২৭. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। পৃঃ—৯২

আলোচনা করেন জার্মান লেখক ব্রোকহাউস্।[২৮] ১৮৬৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি এবং জুলাই মাসে লণ্ডন রয়্যাল এশিয়াটিক্ সোসাইটি তাঁকে সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত করে এক দুর্লভ সম্মানে ভূষিত করে। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও বহু বিবাহ রহিত হওয়া বিষয়ক প্রস্তাবের ইংরাজী অনুবাদগুলি লণ্ডন, প্যারিস[২৯] ও জার্মানীতে তখন প্রচারিত। মিস কার্পেন্টার এদেশে এসেই প্রথমে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন। শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা মিঃ অ্যাটকিনসন একটি চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে লিখলেন,—

"My dear Pandit,

"Miss Carpenter whose name you are no doubt acquainted with, is anxious to make your acquaintance and to talk to you about her projects for furthering female education in India. Could you come at the Bethune School to meet her on Thursday morning about half past 11 o'clock ?[৩০]

বেথুন স্কুলেই মিস কার্পেন্টারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ পরিচয়। মিস কার্পেন্টার ও অ্যাট্‌কিনসন বিদ্যাসাগরকে সঙ্গে নিয়েই কলকাতার ও উত্তরপাড়ার বালিকা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন

---

২৮. বিদ্যাসাগর রিসার্চ সেণ্টার থেকে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর পত্রিকা—২য় সংকলন। পৃঃ—১৫৩

২৯. মাইকেল মধুসূদন দত্তের চিঠি—(৩.১১.৬৪)

"I have seen one or two of your works in a shop in Paris. I told the shopkeeper "This author is a great friend of mine." "Ah Sir" said he, "We thought he was dead."

[যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত]

৩০. Subal Chandra Mitra. পৃঃ—৪৬০

করলেন! পরিশেষে মিস কার্পেন্টার এদেশে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতির জন্য একটি 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' স্থাপনের প্রস্তাব দিলেন।

এ ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অভিজ্ঞতা অন্যদের থেকে অনেক বেশী। ১৮৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে তিনিই প্রস্তাব দিয়েছিলেন—"সংস্কৃত কলেজকে বাংলাবিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষানবিশির জন্য নর্মাল স্কুল হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।" কিন্তু তিনিই বিরোধী হলেন বেথুন স্কুলে 'ফিমেল নর্মাল স্কুল' স্থাপনের প্রস্তাবে।

পরিণত তরুর জন্য পর্যাপ্ত রোদ বাতাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিশুতরু বা চারাগাছকে রোদের তাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় ছায়া দিয়ে। বিদ্যাসাগর ছিলেন বাস্তব চেতনাসম্পন্ন (Pragmatic) পুরুষ। Daniel Lerner-এর ভাষায় "He assumes a calculating attitude toward a manipulable and open future. He is therefore rational and goal-oriented."

প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিদ্যাসাগর তাঁর বক্তব্য ছোটলাট উইলিয়ম গ্রের কাছে পাঠালেন। তিনি বললেন, "এ দেশের নারী সমাজ থেকে শিক্ষয়িত্রী গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা মিস্ কার্পেন্টার নিতে চান, হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থায় তা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

'যে সমাজে দশ এগারো বছর বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিতে হয়, এবং বিয়ের পরে তারা আর অন্দরমহল ছেড়ে বাইরে যাওয়ার কোন অনুমতি পায়না, সেই সমাজের সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা বয়স্কা নারীদের শিক্ষিকার বৃত্তি গ্রহণ করে অন্তঃপুরের বেড়া ভেঙে বাইরে গিয়ে কাজ করার অনুমতি দেবে, এ চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। তা আপনি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারেন। একমাত্র যাদের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে, তারা হল অসহায়া বিধবা নারী, শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁরা উপযুক্ত হবেন কিনা এ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও এ

কথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে অন্তঃপুর ছেড়ে বাইরে এসে সাধারণ শিক্ষিকার বৃত্তি গ্রহণ করার জন্যই তাঁরা সাধারণ মানুষের আস্থা হারাবেন এবং তা হলে দেশীয় শিক্ষিকাদের দিয়ে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে উন্নয়নের আশা আমরা করছি, তা মোটেই সম্ভব হবে না।...

'একথা জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে, বালিকা ছাত্রীদের জন্য ট্রেনিং প্রাপ্ত নারীশিক্ষিকার গুরুত্ব ও বাঞ্ছনীয়তার ব্যাপারে আমি পুরোপুরি একমত।... '

'দেশাচার যদি দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে সমাজকে অনড় করে না রাখত, তবে আমিই সকলের আগে এগিয়ে আসতাম, এবং এই পরিকল্পনাকে সফল করার কাজে আমার সকল শক্তি নিয়োগ করতাম। কিন্তু যখন বুঝতে পারছি যে, কোন ক্রমেই এ কাজে সফল হওয়া সম্ভব নয়, তখন সাময়িক একটি পরীক্ষার জন্য আমার সমর্থনকে এগিয়ে দিতে পারিনা।'[৩১]

নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবকে কেশবচন্দ্র সেনের মতো ব্যক্তিও পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিন্তার পদ্ধতি স্বতন্ত্র। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, অতি কোমল ও স্পর্শকাতর হৃদয় থাকা সত্বেও কর্মক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর কখনও আবেগ ও কল্পনার অনুবর্তী হননি। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল বাস্তব সম্মত ও পরিকল্পিত। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার তাঁর চেয়ে বেশী প্রার্থনীয় আর কার কাছে ছিল? তাই নারী শিক্ষার যে পরিবেশকে সযত্নে তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তাকেই অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তিনি সচেতন ছিলেন যে, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ যে দেশাচারে মানুষের মনকে বেঁধে রাখতে চায়, তার থেকে সমাজমানসকে মুক্ত করে আনতে হলে সতর্ক পদক্ষেপে এগোতে হবে।

---

৩১. বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত পত্রাবলী। পৃঃ—১৮

গভর্ণর উইলিয়াম গ্রে বিদ্যাসাগরের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। তা সত্বেও নর্মাল স্কুল স্থাপনের দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে তিনি বাধ্য হলেন। ১৮৬৮ সালে শিক্ষাদপ্তর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে, বেথুন স্কুলেই শিক্ষিকা প্রশিক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত নর্মাল স্কুল স্থাপিত হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিকে শিক্ষাবিভাগের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। নতুন নিয়ম কার্যকরী হল ১৮৬৯ সালের জানুয়ারীতে। বিদ্যাসাগর ও কমিটির অন্য সদস্যদের স্থান হল উপদেষ্টা সভায়। বিদ্যাসাগর তারপরেই বেথুন কলেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

কিন্তু নারীশিক্ষার কাজ থেকে পিছিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয়গুলি সম্প্রসারণের কাজে হাত দিলেন। ১৮৯০ সালেও তিনি বীরসিংহ গ্রামে, যে গ্রাম তিনি পরিত্যাগ করে এসেছেন ১৮৬৯ সালে, সেই গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করান অনুজ শম্ভুচন্দ্রের মাধ্যমে। বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয় তাঁর মায়ের নামে উৎসর্গ করে নাম দিলেন 'ভগবতী বিদ্যালয়'। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন,—'ভগবতী বিদ্যালয়ে চৌদ্দজন শিক্ষক নিযুক্ত হয় এবং মাসিক দুইশত বাষট্টি টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত হয়।·· স্কুলবাটির জন্য দশ হাজার টাকা...'৩২

১৮৬৯ সালে শিক্ষাদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে বেথুন স্কুলে যে নর্মাল স্কুলটি স্থাপন করা হয়েছিল, অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের পর উপযুক্ত শিক্ষার্থীর অভাবে সেই স্কুল উঠিয়ে দেওয়া হয় গ্রে'র পরবর্তী গভর্ণর জর্জ ক্যাম্বেলের আমলে। ফলে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের সত্যতাই প্রমাণিত হল।

তাঁর জীবনের প্রথমেই বিদ্যাসাগর জনশিক্ষার প্রসারের ওপর জোর দিয়েছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন শিক্ষার আলোক

---

৩২. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত (বুকল্যাণ্ড সংস্করণ)। পৃঃ—২৩৬

ছাড়া মানুষের মনের অন্ধতা ও যুক্তিহীন নির্দয় দেশাচারের প্রতি আনুগত্য দূর করা সম্ভব নয়। সুশিক্ষা যেমন মানুষকে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তেমনি দেশ বড় হয়ে ওঠে। ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের হিন্দু সভ্যতার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শুধু তার উদার জ্ঞান চর্চার দ্বারা। গ্রীস সেই গৌরব লাভ করেছিল ইউরোপে।

১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে 'বাল্য বিবাহের দোষ প্রবন্ধে' এই চিন্তার প্রথম অবতারণা করেন তিনি—

"এতদ্দেশে যদ্যপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত তবে অস্মদ্দেশীয় বালক-বালিকারা মাতৃ সন্নিধান হইতেও সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত।.....

"কন্যাদিগের পিতামাতা যদ্যপি এতদ্দেশীয় বিবাহ নিয়মের বাধ্য হইয়া শিক্ষার উপক্রমের কন্যাদিগকে পাত্রসাৎ না করেন, তবে আর কিছুকাল শিক্ষা করিলেই তাঁহাদিগের সেই দুহিতৃগণ ভাবী সন্তানগণের উপদেশক্ষম হইয়া পিতামাতার অশেষ অভিলাষ সফল করিতে পারেন।"

তাঁর মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে 'ভগবতী বিদ্যালয়'কে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর প্রথমজীবনের আদর্শকে রূপায়িত করেছেন।

জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার আছে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অধিকার ভোগের। নারীকে আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হবে। আর সেই জন্যই দরকার নারীশিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই আধুনিক ভারতের প্রথম মানুষ যিনি শিক্ষার মূলনীতিটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

* * *

১৮৭৩ সালে বিদ্যাসাগর বিহারের কার্মাটার স্টেশনের (বর্তমানে বিদ্যাসাগর স্টেশন) পাশেই বনাকীর্ণ স্থানে একটি ছোট্ট বাংলো তৈরী

করিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, অসুস্থ ও ক্লান্ত শরীরটাকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া, এখানকার অধিবাসী সাঁওতাল ও ধাঙরদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশেছিলেন। তাদের জন্য তাঁর বাংলোতেই একটি নৈশ-বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। আদিবাসী কল্যাণে আধুনিক ভারতে তিনিই প্রথম অগ্রণী হয়েছেন।

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষা ও জনশিক্ষার কাজে তিনি কিভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন, তার বিবরণ কিছুটা খুঁজে দেখতে পারি।

১৮৫৩ সালে স্বগ্রাম বীরসিংহে বিদ্যাসাগর একটি নাইট স্কুল বা সান্ধ্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলে শুধু যে বিনা বেতনে ছাত্ররা পড়ত, তাই নয়, বিনামূল্যে তাদের পুস্তক খাতা পেনসিল প্রভৃতি দেওয়া হত। ঐ সময়েই বীরসিংহ গ্রামে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন বিদ্যাসাগর।

চকদিঘির (বর্ধমান) জমিদার সারদাপ্রসাদ সিংহরায় অপুত্রক ছিলেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করে তাঁর টাকা ও সম্পত্তি অবৈতনিক এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপনের জন্য দান করেন। বিদ্যাসাগর ঐ স্কুল স্থাপনে যেমন সহায়তা করেছিলেন, পরবর্তীকালেও তেমনি স্কুল পরিদর্শন করে তার উন্নতির চেষ্টা করে গিয়েছেন। ভাটপাড়ার রাখালদাস ন্যায়রত্নকে টোল করবার জন্য টাকা দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শেই কাঁদিতে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল স্থাপন করেন। ঐ স্কুলটি পুরোপুরি বিদ্যাসাগরের তত্বাবধানে ছিল। ঘাটালে স্কুলগৃহ তৈরী করার জন্য পাঁচশ' টাকা দিয়েছিলেন আবার বৈঁচি গ্রামের জমিদার বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়কে পরামর্শ দিয়ে বৈঁচি গ্রামে কমলে-কামিনীদেবী দাতব্য স্কুল স্থাপন করান।

তবে শিক্ষাব্রতী বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠ কাজ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন ও কলেজের প্রতিষ্ঠা। কোন সরকারী অনুদান বা সাহায্য

না নিয়ে, ইংরাজ অধ্যাপক বাদ দিয়ে শুধু মাত্র বাঙ্গালী অধ্যাপক দিয়ে দেশীয় ব্যবস্থাপনায় একটি বেসরকারী কলেজ স্থাপন এবং তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া তাঁর অদম্য পৌরুষের পরিচয়। বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"সংস্কৃত কলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি মেট্রোপলিটান ইনষ্টিট্যুসন। বাঙ্গালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল।"

বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

"ইহাই কলিকাতায় বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত ও বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বেসরকারী কলেজের পথপ্রদর্শক। এই মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠা না হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং পাদ্রীদের কলেজের উপরেই বহুল পরিমাণে বাঙ্গালীর উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা লাভ নির্ভর করিত।"

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৯ সালে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী ও অন্য কয়েকজনের চেষ্টায়। তাঁদের আগ্রহে স্কুল কমিটির সভাপতি-রূপে বিদ্যাসাগর যোগদান করেন। নতুন কমিটি তৈরী হয় ৮৬২ সালে. স্কুলের নাম বদলে হয় হিন্দু মেট্রোপলিটান স্কুল এবং বিদ্যা-সাগর হন সম্পাদক। পরিচালকরা স্কুল চালাতে না পারায় পুরো কর্তৃত্ব বিদ্যাসাগরের হাতে আসে, এবং ১৮৬৫-৬৬ সালে 'হিন্দু' শব্দ তুলে দিয়ে তিনি নামকরণ করেন মেট্রোপলিটান ইন্-ষ্টিটিউসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ইনষ্টিটিউসনের ফলাফল অত্যন্ত ভাল হওয়ায় বিদ্যাসাগর উৎসাহী হয়ে কলেজ খুলবার জন্য সচেষ্ট হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন পত্র দেন ১৮৬৬ সালে। এই সময় স্কুল

কমিটিতে বিদ্যাসাগর (সম্পাদক) ছাড়াও ছিলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও হরচন্দ্র ঘোষ।

স্কুলটিকে বিদ্যাসাগর নিয়ে যান সুকিয়া স্ট্রীটে এক ভাড়াবাড়ীতে। মিশনারী সাহেবদের প্রতিবন্ধকতায় সিণ্ডিকেট তাঁর প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। আসলে এই সময়ে খ্রীষ্টান ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিভূ পাদরীরা বেসরকারী ক্ষেত্রে কোন ইংরাজী স্কুল বা কলেজ স্থাপনের চেষ্টাকে তাঁদের উদ্দেশ্যের পক্ষে হানিকর বলে মনে করেছিলেন। তাই দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে বিদ্যাসাগরকে। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টায় ১৮৭২ সালে উপাচার্য বেলির সহায়তায় সিণ্ডিকেট মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনকে অনুমোদন করলে গভর্ণর জেনারেল সম্মতি দেন। ইনষ্টিটিউসনে এফ. এ ক্লাস খোলা হয়।

কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভাল ভাল লোক সংগ্রহ করে আনেন বিদ্যাসাগর। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে হেয়ার স্কুল থেকে নিয়ে আসেন সূর্যকুমার অধিকারীকে (বিদ্যাসাগরের জামাতা) এবং তাঁকে ইনষ্টিটিউসনের সম্পাদক পদটি দেন। ১৮৭৯ সালে বি. এ ক্লাস খোলার অনুমতি পাওয়া গেলে মেট্রোপলিটান ইন্‌ষ্টিটিউসন পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত হয়। প্রথম অধ্যক্ষ হন সূর্যকুমার অধিকারী।

ইনষ্টিটিউসনের ফলাফল এত ভাল হয়েছিল যে; শিক্ষাদপ্তরের রিপোর্টে লেখা হয়—

"The Metropolitan Institution under the management of Pandit Iswar Chandra Bidyasagar, is the best of these unaided schools and was at the last University Examination one of the most successful schools in India."

কলকাতায় ইনষ্টিটিউসনের তিনটি শাখা খোলা হয়। ১৮৭৪ সালে শ্যামপুকুরে, ১৮৮৫ সালে বউবাজারে এবং ১৮৮৭ সালে বড়বাজারে বালাখানায়।

১৮৮৪ সালে কলেজে আইনের ক্লাস খোলার অনুমতি পাওয়া যায়। এরপরই স্কুল কলেজের জন্য সুকিয়া ষ্ট্রীটের ভবনে স্থানাভাব হওয়ায় এবং সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ীর মালিক বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেওয়ায় শঙ্কর ঘোষ লেনের জমিটি কেনা হয় ত্রিশ হাজার টাকায়। নতুন বাড়ীতে স্কুল ও কলেজ স্থানান্তরিত করা হয় ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে।

এই হল মেট্রোপলিটান ইষ্টিটিউসন ও কলেজ (বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। ১৮৮৮ সালে সূর্যকুমারের সঙ্গে ইনষ্টিটিউসন ও কলেজের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে আবার দায়িত্ব নিজের হাতেই নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।*

মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসন ও কলেজ ছিল তাঁর শেষ জীবনের স্বপ্ন। তাঁর আশা ছিল, দেশজুড়ে শিক্ষার একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলবেন যার শরিক হবে দেশের সাধারণ মানুষ। এ দেশের কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষের মনের অন্ধকারে সংস্কার ও দেশাচাররূপী বাদুড়ের বাসা; আধুনিক বিশ্বের অন্তহীন দিগন্তের উদার আলোক সে অন্ধকারে পৌঁছোতে পারে না। শিক্ষার মশাল জ্বেলে এগোতে হবে পথ খুঁজে খুঁজে; গড়ে নিতে হবে মানবিক সহৃদয়তার ভিত্তিতে সমাজ।

সে সমাজে বর্ণবৈষম্য যেমন থাকবেনা, তেমনি থাকবে না নারীর প্রতি পুরুষের হিংস্র নির্যাতন। সকল মানুষের প্রতি করুণায় যিনি দান করেছেন তাঁর সর্বস্ব, দুর্ভিক্ষে, পীড়ায়, মহামাড়ীতে যিনি অভয় নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সকলের মাঝখানে, মানুষের সমাজের

---

* মেট্রোপলিটান কলেজের ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যপঞ্জীর জন্য দ্রষ্টব্য ঃ

১. শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবন চরিত।

২. Subal Chandra Mitra—Ishwar Chandra Vidyasagar.

৩. বিদ্যাসাগর কলেজ শতবর্ষ স্মরণিকা—সুরেশপ্রসাদ নিয়োগীর 'মেট্রোপলিটান কলেজের ইতিহাস।'

কাছ থেকে তিনি চেয়েছিলেন প্রতিদান—যার প্রকাশ মানবিকতায় এবং যুক্তি ও বিচারের অনুভবে।

একাত্তর বছর বয়সে পৌঁছে তিনি জীর্ণ, অসুস্থ ও ক্লান্ত। অসুস্থ শরীর সারিয়ে নিতে ডাক্তার তাঁকে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও, কোন স্বাস্থকর স্থানে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কার্মাটার তাঁর অতি প্রিয় জায়গা। কিন্তু মেট্রোপলিটান কলেজ ছেড়ে তিনি দূরে যেতে চাইলেন না। কলেজের ভার যাঁর ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারতেন, তিনি কলেজে আর আসেন না। রুগ্ন শরীরে জীবনের শেষ অবস্থাতেও পালকি করে কলেজে এসেছেন বিদ্যাসাগর।

কলেজে তখন সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ছাত্রদের পাঁচ বছর ধরে মুখস্থ করতে হত। এই অযথা পরিশ্রম ও সময়ের অপব্যয় বাঁচাতে বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী লিখলেন, যার ফলে সংস্কৃত শিক্ষা ছাত্রদের কাছে সহজ হয়ে গেল। সংস্কৃতে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ণ করতে হত সকলকে। বিদ্যাসাগর ইংরাজীতে আধুনিক গণিতের শিক্ষা প্রবর্তন করলেন।

* * *

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে যখন মানুষের চিন্তা বুদ্ধি ও সমাজ ভাবনা যুগান্তব্যাপী ধর্মান্ধতা, লৌকিক আচার নিষ্ঠা, উগ্র স্বাজাত্য বোধ ও নির্দয় প্রথাপালনের জটিল লতাতন্তুতে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেন যুগের প্রয়োজনেই এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য জীবন চেতনা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবন চেতনায় মানবতার রূপ উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে শোভা পেয়েছে; যদিও আকৃতি ও বেশভূষায় তিনি পুরো ভারতীয়, তবু জীবনের উপলব্ধিতে তিনি পুরো ইউরোপীয়। আপন সমাজের বিষাক্ত পরিবেশকে নীলকণ্ঠের মতো কণ্ঠে ধারণ করে তিনি মানুষকেই চিরন্তন সত্য

বলে গ্রহণ করলেন; মানুষের প্রতি বেদনা বোধ এবং সামাজিক কল্যাণ বোধে তিনি স্বজাতীয় সমাজের যে সংস্কার কামনা করলেন তার মূলে ছিল তাঁর চেতনালব্ধ আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রেরণা।

নব্যদর্শনের চেতনা তাঁর মনকে মুক্তি দিয়েছিল, আর সেই মুক্তির আলোকে সমগ্র জাতির মানসকে তিনি শুদ্ধ করে নিতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই সাধনার বা তপস্যার বেদীটি জ্ঞান ও কল্যাণ বোধে প্রতিষ্ঠিত। সমাজ সংস্কারের যে বিস্তৃত কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার রূপায়ণে তাঁর অস্ত্র ছিল শিক্ষা ও যুক্তিবিদ্যা। প্রমথনাথ বিশীর কথা উদ্ধৃত করে বলতে পারি, "কাজের পথের বাধা ছিন্ন-ভিন্ন করিবার জন্য তাঁহার হাতে ছিল একখানা অসি; চালনা নৈপুণ্যে সেই একখানা অসিকে দশখানা মনে হইয়াছে—সাহিত্য, করুণা, শিক্ষাবিস্তার, সমাজ সংস্কার, কত না মনে হইয়াছে; কিন্তু অসি দশখানা নয় একখানা মাত্র, সেখানার নাম লজিক।" এই লজিক বা যুক্তিবিদ্যা মানুষের মনের সমস্ত অন্ধতা ও বৈষম্য বোধকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেওয়ার জন্য তিনি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। তার জন্য শিক্ষা সংস্কার এবং একই কারণে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে তাঁর প্রয়াস।

প্রমথনাথ বিশীর আর একটি উক্তি—"বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরের মত Practical ব্যক্তি আর কেহ জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ।" অত্যন্ত বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন বলেই, তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে প্রায় একই সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। অথচ শিক্ষণীয় বস্তু নির্বাচনে তিনি পশ্চিমের বিজ্ঞান চেতনা ও মানবিকতার দর্শনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বেন্থাম, হিউম ও মিলের উপযোগবাদ এবং মানবিক প্রেরণা যাতে এ দেশের

ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করে, তার জন্যই তিনি আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন পাঠ্যসূচীভুক্ত করেছেন। বুদ্ধি বৃত্তির চরম বিকাশ ও উৎকর্ষ সমাজকে বাস্তব উন্নতির পথে নিতে পারে না, যদি জীবন বোধের সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকে—এ'কথা বোঝানোর জন্যই বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনের পরিপূরক হিসাবে তিনি মিল পড়াবার কথা বলেছেন। উদ্দেশ্য ছাত্রদের বিচার বোধকে জাগ্রত করা।

যে সেক্যুলার চিন্তার পথে আমরা আজ পা দিয়েছি, তার উদ্‌গাতা ছিলেন বিদ্যাসাগর। সে যুগে, ধর্মই যখন ছিল মানুষের জীবনের প্রেরণা, তখন সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদর্শন বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কে দিতে পারতেন। রামমোহনের সংস্কার চিন্তার মূলে ছিল বেদান্ত দর্শন। রামমোহনের ব্রহ্মসভা দেবেন্দ্রনাথের হাতে ব্রাহ্মধর্মের রূপ নিয়েছে; খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো মানুষকেও ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের আশ্রমে ছুটে গিয়েছেন কলকাতার শিক্ষিত ও অভিজাত মানুষেরা। বিদ্যাসাগরের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাচিন্তা মানুষের মনে সেদিন শেকড় গাড়তে পারেনি; আজও পারেনি। বিদ্যাসাগরের উত্তরকালে আমাদের জাতীয়তার আন্দোলন ধর্মকে, বঙ্কিম বিবেকানন্দের গীতা ও বেদান্তবাদকে আশ্রয় করেই দাঁড়িয়েছে। সম্ভবতঃ এইটাই কারণ, যার জন্য, ভারতবাসীর আধুনিক মানসিকতার যিনি জনক, যিনি পরিপূর্ণ মুক্ত মন নিয়ে আমাদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন, তাঁকে আমরা জান্‌তে চেষ্টা করিনি।

প্রাচীন যুগের বিশুদ্ধ চৈতন্যবাদ আমাদের মন থেকে এখন বিলুপ্ত, বেদান্ত নিয়ে মুখে যতই গর্ব করি না কেন, ব্রহ্ম চিন্তা এ যুগে কোন মানুষের মধ্যেই নেই। অথচ ধর্ম-নিরপেক্ষ উদার মানবিকতার বোধও আমাদের মনে নেই। বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি বলেই, আজ নতুন করে তাকে ভাবতে চেষ্টা করছি।

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

অসংযুক্ত বর্ণ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

একবিংশ বার মুদ্রিত

কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র

সংবৎ ১৯১৮

মূল্য তিন পয়সা

অষ্টাদশ বারের বিজ্ঞাপন

বর্ণপরিচয়ের প্রথমভাগ অষ্টাদশ বার মুদ্রিত হইল। এই পুস্তক যে রীতিতে এতদিন মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সুকুমারমতি পাঠকবর্গের পক্ষে কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা ঘটিত, সেই অসুবিধার পরিহার মানসে বর্ণযোজনা প্রকরণে ক্রমবিপর্য্যয় অবলম্বিত হইয়াছে।

কলিকাতা

১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১৭

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

স্বরবর্ণ

অ আ ই ঈ

উ ঊ ঋ ঌ

এ ঐ ও ঔ

বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা

অ এ ঋ ই

ও ঌ ঐ উ

ঔ ঈ আ ঊ

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ং	ঃ	ঁ	

র ব ক ঝ ধ

জ য য় ম ঘ

ম স খ থ ফ

চ ঠ ট ঢ ঢ়

গ ল শ ছ হ

ড ড় ঙ ত ভ

ঞ দ প ণ ন

ং ঃ ঁ

অথ	কর	ছল	নখ
ইহ	খল	জল	নর
ঈশ	গণ	তট	পট
ঋণ	ঘন	দশ	পণ
এক	চর	ধন	পথ

পর	মন	রব	বশ
ফল	যব	রস	শঠ
বল	যশ	বক	শত
ভয়	রণ	বট	শর
মত	রথ	বন	শব

অচল	অভয়	আদর	ইতর
অধম	অযশ	আনন	ঈষৎ
অধর	অলস	আলয়	উদয়
অনল	অবশ	আশয়	উদর
অপর	আকর	আসন	উভয়

ঔষধ	কলস	গহন	জনক
কপট	কলহ	চপল	তনয়
কমল	গগন	চরণ	তরল
করণ	গণন	চরম	দমন
কলস	গরল	জঠর	দশন

দশম	পরম	বচন	সকল
ধবল	ভবন	বসন	সদয়
নয়ন	মরণ	শকট	সফল
নবম	যবন	শয়ন	সরল
পবন	লবণ	শরণ	সহজ

অকপট	আচরণ	জলচর
অনশন	আভরণ	জলধর
অপচয়	আবরণ	পদতল
অবগত	আহরণ	পরবশ
অসময়	করতল	শতদল

আকার যোগ

আ া

ক আ কা ম আ মা

উদাহরণ

কাক	তাপ	ভাগ	বার
কাল	নাম	মান	বাস
গান	নাশ	মাস	শাক
ঘাস	পাঠ	লাভ	সার
জাল	পাপ	বাম	হার

আভা	দয়া	তারা	মাতা
আশা	দশা	দাতা	মায়া
কথা	লতা	ধারা	মালা
গদা	সদা	বাধা	রাজা
জটা	সভা	ভাষা	শাখা

কানন	লালন	সাগর
কারণ	বানর	সারস
চামর	বামন	সাহস
পায়স	বাহন	অনাথ
মানস	শাসন	অসার

আকার	উপায়	অথবা
আকাশ	কষায়	গণনা
আচার	সমান	রচনা
আষাঢ়	সমাজ	রসনা
আহার	সহায়	বাসনা

জাগরণ	অপমান	উপহাস
অকারণ	অপরাধ	সাধারণ
মহাশয়	অপলাপ	অনাচার
সমাপন	অবকাশ	আরাধনা
অপকার	উপকার	উপাসনা

ইকার যোগ।

ই ি

ক ই কি ব ই বি

উদাহরণ

তিল	অসি	দধি	রবি
দিন	আদি	পতি	শনি
বিষ	কলি	মণি	গিরি
হিত	কবি	মতি	নিধি
হিম	গতি	যদি	বিধি

কিরণ	কঠিন	অবধি
নিয়ম	চলিত	তিমির
বিনয়	মলিন	শিথিল
বিষম	মহিষ	শিশির
বিষয়	হরিণ	অতিথি

অতিশয়	অবিনয়	অবিদিত
অনিয়ম	কতিপয়	পরিচিত
অভিনব	পরিচয়	পরিমিত
অভিমত	পরিজন	বিকশিত
অবিকল	পরিণয়	বিচলিত

ঈকার যোগ।

ঈ ী

ক ঈ কী ত ঈ তী

উদাহরণ

কীট	ধীর	মীন	ঋণী
গীত	নীচ	বীজ	ধনী
জীব	নীল	বীর	নদী
তীর	পীত	শীত	শশী
দীন	ভীত	হীন	সখী

জীবন	অসীম	কথনীয়
পীড়ন	গভীর	কমনীয়
শীতল	নবীন	করণীয়
অতীত	জননী	গণনীয়
অলীক	রজনী	রমণীয়

উকার যোগ।

উ ু

ক উ কু স উ সু

উদাহরণ

কুল	বুধ	অণু	তনু
কুশ	মুখ	ঋজু	পটু
ঘুণ	সুখ	ঋতু	মধু
তুষ	সুত	কটু	লঘু
পুর	সুর	জতু	বসু

কুশল	অতুল	অনুগত
ভুবন	আতুর	অনুপম
মুখর	চতুর	অনুভব
যুগল	কুসুম	মধুকর
সুলভ	মুকুল	সমুদয়

উকার যোগ।

উ ু

উদাহরণ

কূপ	দূর	মূক	দূষণ
কূল	ধূম	মূঢ়	নূতন
তূণ	পূত	মূল	ভূষণ
দূত	ভূত	শূল	ময়ূর

ঋকার যোগ

ঋ ৃ

ক ৠ কৃ ম ঋ মৃ

উদাহরণ

কৃশ	দৃঢ়	কৃপণ
কৃত	বৃত	পৃথক
গৃহ	মৃগ	আবৃত
ঘৃত	মৃত	মসৃণ
তৃণ	বৃষ	সদৃশ

একার যোগ।

এ ে

ক এ কে দ এ দে

উদাহরণ

কেশ	মেঘ	কেবল
খেদ	মেষ	সেবক
দেশ	লেশ	আদেশ
ভেক	বেশ	আবেশ
ভেদ	শেষ	উপদেশ

ঐকার যোগ

ঐ ৈ

ত ঐ তৈ দ ঐ দৈ

উদাহরণ

তৈল	শৈল	শৈবল
দৈব	কৈতব	শৈশব
বৈধ	ভৈরব	অবৈধ

ওকার যোগ

ও ো

ক ও কো   ব ও বো

উদাহরণ

কোণ	দোষ	রোষ
কোপ	বোধ	লোক
কোষ	ভোগ	লোভ
গোল	যোগ	শোক
চোর	রোগ	সোম

কোমল	যোজন	ষোড়শ
গোপন	রোদন	সোদর
গোময়	রোপণ	অবোধ
পোষণ	লোচন	অশোক
ভোজন	শোধন	কঠোর

অগোচর	মনোহর
আয়োজন	মহোদয়
আরোহণ	সরোবর
তপোবন	সহোদর
ফলোদয়	মনোযোগ

ঔকার যোগ

ঔ ৌ

ক ঔ কৌ   প ঔ পৌ

উদাহরণ

কৌল	পৌষ	কৌশল
গৌর	ভৌম	গৌরব
চৌর	মৌন	যৌবন
ধৌত	লৌহ	সৌরভ
পৌর	শৌচ	অশৌচ

সাঙ্কেতিক উ ঊ ঋ যোগ

গ	গু		হ	উ	হু
র	রু		র	ঊ	রূ
শ	শু		হ	ঋ	হৃ

উদাহরণ

গুড়	গুরু	রূঢ়
গুণ	শুক	রূপ
চরু	শুভ	হৃত
তরু	পশু	পুরুষ
মরু	বহু	আরূঢ়

পিতা	মৃদু	রিপু	ভূমি
পূজা	ঘৃণা	বাহু	শিলা
ধেনু	শোভা	নীতি	কৃপা
সেনা	সেবা	সুখী	পীড়া
সাধু	মেধা	ধাতু	রাশি
শিখা	রীতি	সেতু	খেলা
বেণু	শিশু	বীণা	সীমা

বিকার	কোকিল	পৈতৃক
বিশেষ	মানুষ	বিষাদ
দয়ালু	বিচার	শৃগাল
পৃথিবী	কুপিত	যামিনী
মহিমা	শিরীষ	শোভিত
কৌপীন	দুরূহ	নৃপতি
বৈশাখ	রুধির	নিষেধ
বিরোধ	গৃহিণী	লৌকিক
কৌতুক	ভূপতি	মেধাবী
বালিকা	একাকী	শারিকা

তাদৃশ	করুণা	পুরাণ
মায়াবী	মেদিনী	শোণিত
মৃগয়া	নিরীহ	ভূষিত
বিড়াল	মাতুল	সোপান

অধিকার	পরিতোষ	অভিমান
পরিহাস	বিবেচনা	কোলাহল
অনুমান	অভিলাষ	পিতামহী
পুরাতন	নিরূপণ	বিপরীত
বশীভূত	পরিশোধ	পূজনীয়
অনুরাগ	আলোচনা	মাতামহী
পিতামহ	সমাবেশ	কৌতূহল

অভিলষিত	অনুশীলন
অসাধারণ	অপরিচিত
অনুধাবন	অবিবেচনা
অনধিকার	অশোচনা
নিরপরাধ	অনবকাশ
অনবধান	অভিনিবেশ
পারিতোষিক	পারলৌকিক

অনুস্বার যোগ

অ ং অং ব ং বং

উদাহরণ

অংশ	দংশন
বংশ	সংযোগ
হংস	সংশয়
সিংহ	সংসার
হিংসা	মীমাংসা

বিসর্গ যোগ

ক ঃ কঃ ন ঃ নঃ

উদাহরণ

দুঃখ	দুঃসময়
দুঃখী	দুঃসাহস
দুঃখিত	নিঃসরণ
দুঃসহ	নিঃসহায়
নিঃশেষ	অধঃপাত

চন্দ্রবিন্দু যোগ

আ ◌ঁ আঁ ছ ◌ঁ ছঁ

উদাহরণ

চাঁদ	বাঁধ	কাঁটা

ছাঁদ	বাঁশ	বাঁকা
দাঁত	হাঁস	আঁচল
ফাঁদ	কাঁচা	সিঁদুর

১ পাঠ

বড় গাছ।
ছোট পাতা।
লাল ফুল।
ভাল জল।
সোজা পথ।

২ পাঠ

কথা শুন।
হাত ধর।
পথ ছাড়।
বাড়ী যাও।
ভাত খাও।

৩ পাঠ

খেলা করে।
কথা কয়।
হাত নাড়ে।
মেঘ ডাকে।
জল পড়ে।

৪ পাঠ

কোথা যাও?
কি পড়?
কাছে এস।
মুখ ধোও।
ধারে চল।

৫ পাঠ

নূতন ঘটী।
পুরাণ বাটী।

৬ পাঠ

বাহিরে যাও।
ভিতরে এস।

কাল পাথর। কপাট খোল।
সাদা কাপড়। দুয়াত রাখ।
শীতল জল। কলম দাও।

৭ পাঠ

আমি যাইব।
সে আসিবে।
তিনি গিয়াছেন।
তোমরা যাও।
আমরা যাইতেছি।
কে আসিতেছে?

৮ পাঠ

কাক ডাকিতেছে।
গরু চরিতেছে।
পাখী উড়িতেছে।
জল পড়িতেছে।
পাতা নড়িতেছে।
ফুল ঝুলিতেছে।

৯ পাঠ

আমার বই নাই।
তোমার কলম নাই।
যদুর কাগজ আছে।
রামের কালী নাই।
মধুর ভাল দুয়াত।
নবীনের কাল কাপড়।
ভুবনের ছাতা নাই।

১০ পাঠ

আমি মুখ ধুইয়াছি।
তুমি কাপড় পড়।
তোমার ধুতি কই?
আমার চাদর নাই।
মাধব পড়িতে গিয়াছে।
যাদব শুইয়া আছে।
মধু খেলা করিতেছে।

১১ পাঠ

রাম তুমি হাসিতেছ কেন ?
সে কেন বসিয়া আছে ?
আজ আমি পড়িতে যাইব না।
তিনি সেখানে কখন যাইবেন ?
আমি কালি সকালে যাইব।
তুমি একলা কোথা যাও।
তোমরা এখানে কি করিতেছ ?

১২ পাঠ

তুমি কখন পড়িতে যাইবে ?
রাম কালি সকালে আসিবে।
তোমার গোন হইল কেন ?
আমি আজি বিকালে যাইব।
কালি আমরা পড়িতে যাই নাই।
সে কখন্ বাড়ী গেল ?
আমি সেখানে গিয়াছিলাম।

১৩ পাঠ

কখন মিছা কথা কহিও না।

কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না।
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারাদিন খেলা করিও না।

১৪ পাঠ

আমার অসুখ হইয়াছে আজি পড়িতে যাইব না।
কালি জল হইয়াছিল পথে কাদা হইয়াছে।
তুমি দৌড়িয়া যাও কেন পড়িয়া যাইবে।
কৈলাস কালি পড়া বলিতে পারে নাই।
উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে।
কালি বিকালে রাম আমাদের বাড়ী আসিবে।
কেদার আজি পড়িতে যায় নাই।

১৫ পাঠ

তারক ভাল পড়িতে পারে।
ঈশান কিছুই পড়িতে পারে না।
সদয় কালি পড়া বলিতে পারে নাই।

শশী বেশ পড়ে সে আমাকে পড়া বলিয়া দেয়।

অভয় বড় বোকা যা পড়ে তাই ভোলে কিছুই মনে থাকে না।

উদয় কালি গালি দিয়াছিল আমি তাহার সহিত কথা কহিব না।

বেণী সারাদিন খেলা করিয়া বেড়ায় লেখাপড়ায় মন দেয় না।

১৬ পাঠ

আর রাতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ ধুইয়া কাপড় পড়ি। কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি। ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না। পড়া বলিতে না পারিলে গুরু মহাশয় রাগ করিবেন। নূতন পড়া দিবেন না।

১৭ পাঠ

বেলা হইল। পড়িতে চল। আমার কাপড় পড়া হইয়াছে। তুমি এখন কাপড় পর নাই। আমার

বই লইয়াছি। তোমার বই কোথায়? এস যাই আর দেরি করিব না। কালি আমরা সকলের শেষে গিয়াছিলাম। সব পড়া শুনিতে পাই নাই।

১৮ পাঠ

দেখ রাম কালি তুমি পড়িবার সময় বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল করিলে ভাল পড়া হয় না। কেহ শুনিতে পায় না। তোমাকে বারণ করিতেছি আর কখন পড়িবার সময় গোল করিও না।

১৯ পাঠ

নবীন কালি তুমি বাড়ী যাইবার সময় পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলেমানুষ জান না কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি দাও আমি সকলকে বলিয়া দিব কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে না।

গিরিশ কালি তুমি পড়িতে এস নাই কেন? শুনিলাম কোন কাজ ছিল না। মিছামিছি কামাই করিয়াছ। সারাদিন খেলা করিয়াছ। রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ। বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজি তোমাকে কিছুই বলিলাম না। দেখিও আর যেন এমন হয় না।

অঙ্ক

১	২	৩	৪	৫
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ
৬	৭	৮	৯	১০
ছয়	সাত	আট	নয়	দশ

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

সংস্কৃত কলেজ সংস্কার প্রস্তাব

ব্যাকরণ বিভাগ

১। বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগ পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে ভট্টিকাব্যের কয়েক সর্গ ও অমরকোষের কিয়দংশ অধীত হয়। এই বিভাগে অধ্যয়ন করিতে চারি বৎসরকাল নির্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু উপরোক্ত পঞ্চবিভাগে অধ্যয়ন করিতে হইলে পাঁচ বৎসর সময় অতিবাহিত করা প্রয়োজন বোধ হয়। অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীর অভাবে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বালকেরা এই বিভাগে পাঠকালে যে সময় অতিবাহিত করে, সময়ের সহিত তুলনা করিলে, তাহাদিগের শিক্ষা যৎসামান্য বলিতে হইবে। মুগ্ধবোধ অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ। ইহার প্রণেতা বোপদেব, সংক্ষিপ্ততার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় থাকাতে তিনি তাঁহার পুস্তককে অতিশয় দুরূহ করিয়াছেন। একে সংস্কৃত ভাষা অতিশয় কঠিন, তাহাতে একখানি দুরূহ ব্যাকরণ সহকারে ইহার শিক্ষা শুরু করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এতাদৃশ ব্যাকরণে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে যেরূপ কষ্টে পতিত হইতে হয়, তাহা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। সুকুমার-মতি বালকবৃন্দ সংস্কৃত শিক্ষার আরম্ভ কালে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কাঠিন্য প্রযুক্ত তাহাদিগের শিক্ষকগণের উচ্চারিত কথাগুলি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখে। তাহারা যে পুস্তক পাঠ করে, তাহার বিন্দুবিসর্গও নিজে নিজে বুঝিতে পারে না। এইরূপে কেবল ব্যাকরণ অধ্যয়নেই পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হয়। কিন্তু ভাষায় কিঞ্চিন্মাত্রও প্রবেশাধিকার জন্মে না। ইহা

নিতান্তই বিস্ময়কর যে, এক ব্যক্তি ভাষাশিক্ষায় পাঁচ বৎসরকাল ব্যয় করিল, অথচ তাহার বিন্দুমাত্রও বুঝিতে সমর্থ হইল না। বিশেষতঃ মুগ্ধবোধের বৃহদাকার টীকা টিপ্পনী সত্ত্বেও উহা নিতান্তই অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। সুতরাং বর্তমান পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রের প্রথম পাঁচ বৎসর বৃথা ব্যয় হয়। তাহার সমস্ত পরিশ্রম ও কষ্টের ফল এইমাত্র হয় যে, ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাহার অধীতবিদ্যা নিতান্তই অসম্পূর্ণ। এই বিভাগে ধাতুপাঠ নামে যে অপর পুস্তক অধীত হয়, তাহা ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃত ধাতু সংগ্রহ মাত্র। অমরকোষ একখানি ছন্দোনিবদ্ধ অভিধান। আমি স্বীকার করি যে, এই গ্রন্থ সম্যকরূপে আয়ত্ত হইলে সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন কালে কিছু সুবিধা হইতে পারে ; কিন্তু গ্রন্থদ্বয় মুখস্থ করিতে যে সময় ও পরিশ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার তুলনায় প্রাপ্ত উপকার অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ প্রচলিত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের ভূষণস্বরূপ, প্রায়ই প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের অত্যুৎকৃষ্ট ব্যাখ্যায় অলঙ্কৃত ; সুতরাং উক্ত পুস্তকদ্বয়ের অধ্যয়ন নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এস্থলে ইহার উল্লেখ আবশ্যক যে, উপরোক্ত টীকাকার তাঁহার অন্যান্য সহযোগীর ন্যায় নহেন। তাঁহারা গ্রন্থের দুরূহ অংশগুলি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল অংশগুলি বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। এই সকল বিষয় সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিশেষ প্রতীতি হইবে যে, মুগ্ধবোধ, ধাতুপাঠ ও অমরকোষ পাঠে পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত করা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। এই বিভাগে অপর পাঠ্যপুস্তক ভট্টিকাব্য। ইহা রাম ও তাঁহার কার্যকলাপ সমন্বিত একখানি পদ্যগ্রন্থ। এই পুস্তকখানি ব্যাকরণ শাস্ত্রের সূত্র সকলের উদাহরণ প্রদর্শনাভিপ্রায়েই লিখিত হইয়াছে। ইহা ব্যাকরণ বিভাগে নিতান্ত অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না।

এক্ষণে ব্যাকরণ-বিভাগে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার করিতে ইচ্ছা করি। আমার সামান্য বিবেচনায় ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া

বোধ হয় যে, চারি বৎসর ব্যাকরণ বিভাগে অতিবাহিত করা নির্ধারিত আছে, উক্ত সময়ের মধ্যে যে ছাত্রেরা কেবল ব্যাকরণেই পারদর্শিতা লাভ করিবে, তাহা নহে ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ সাহিত্যেও কিঞ্চিৎ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে। এক্ষণে তাহারা সাহিত্য বিভাগে যে ক্লেশ অনুভব করে, তাহাদিগকে আদৌ তাহা করিতে হইবে না। একখানি অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ অধ্যয়নানন্তর তাহাদিগকে সাহিত্য বিভাগে প্রবেশ করিতে হয় এবং ভাষায় তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও জ্ঞান জন্মে না।

আমি যে প্রণালী প্রচলনের পক্ষপাতী, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ বালকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ করিবার পরিবর্তে এদেশীয় ভাষায় রচিত ব্যাকরণের প্রধান নিয়ম ও সূত্রগুলি পাঠ করিবে। তৎপরে তাহারা দুই কিংবা তিনখানি সংস্কৃত পাঠ্য অধ্যয়ন করিবে। এই সকল গ্রন্থে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ হইতে বালকদিগের পাঠোপযোগী উদ্ধৃত অংশ থাকিবে। এই সমস্ত পাঠে ছাত্রদিগের দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইবে। তৎপরে তাহারা সিদ্ধান্ত কৌমুদী আরম্ভ করিবে ও তাহা ব্যাকরণ বিভাগে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করিবে। সমস্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে এইখানি সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে একমাত্র সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহা যেরূপ সম্পূর্ণ তাদৃশ সরল। সিদ্ধান্তকৌমুদীর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রেরা রঘুবংশ ও ভট্টিকাব্য হইতে উদ্ধৃত অংশ ও দশকুমার চরিত পাঠ করিবে। আমার প্রস্তাব এই যে, পাঁচটি শ্রেণীর পরিবর্তে চারিটি মাত্র শ্রেণী থাকিবে ও পঞ্চমটি চতুর্থ শ্রেণীর একটি বিভাগ বলিয়া গণ্য হইবে। উভয় বিভাগেই একই পুস্তক অধীত হইবে। এই বন্দোবস্ত দ্বারা একটি বৎসর বাঁচিয়া যাইবে এবং ব্যাকরণ-বিভাগে পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চারি বৎসর নির্ধারিত হইবে।

ব্যাকরণ বিভাগ হইতে ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে উন্নীত হইলে তাহাদিগকে এখানে দুই বৎসর কাল পাঠ করিতে হয়। তাহারা এখানে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি অধ্যয়ন করে—১] রঘুবংশ, ২] কুমার-সম্ভব, ৩] মেঘদূত, ৪] কিরাতার্জুনীয়, ৫] শিশুপাল বধ, ৬] নৈষধ-চরিত, ৭] শকুন্তলা, ৮] বিক্রমোর্বশী, ৯] রত্নাবলী, ১০] মুদ্রারাক্ষস, ১১] উত্তর চরিত, ১২] দশকুমার চরিত ও ১৩] কাদম্বরী।

তাহারা এখানে বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে অভ্যাস করে ও গণিত শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে। উপরোক্ত ত্রয়োদশখানি পুস্তকের মধ্যে ছয়খানি প্রসিদ্ধ পদ্যগ্রন্থ। সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ নাটক; অবশিষ্ট দুখানি গদ্য রঘুবংশ একখানি ঐতিহাসিক পদ্যগ্রন্থ ও উনবিংশ সর্গে বিভক্ত। গণিত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জ্যোতিষ-শিক্ষা-প্রকরণে প্রকাশ করিব। আমি যে পরিবর্তনের প্রস্তাব করি, তাহা এই; ব্যাকরণ বিভাগ সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি উল্লেখ করিয়াছি. রঘুবংশ প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীতে অধীত হউক ও দশকুমার চরিতের উদ্ধৃত অংশ সকল অপর একটি ব্যাকরণ বিভাগে পঠিত হউক এবং শিশুপাল বধ, কিরাতার্জুনীয় ও নৈষধ চরিতে অনেক অশ্লীল শ্লোক থাকা প্রযুক্ত সমস্ত পঠিত হইবার পরিবর্তে ইহাদের উদ্ধৃত অংশসমূহ পঠিত হউক। কাদম্বরীর পূর্বপাঠ পাঠ্য-পুস্তকরূপে গণ্য হউক। অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থ সমস্তই পঠিত হউক। আমি ইহাও প্রস্তাব করিতেছি যে, বীরচরিত ও শান্তিশতক এই শ্রেণীতে পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হউক। বীরচরিত ও উত্তরচরিত একখানি নাটক-রূপে পরিগণিত হইতে পারে। তন্মধ্যে বীরচরিত পূর্বার্ধ ও উত্তরচরিত অপরার্ধ। বীরচরিতও উত্তরচরিত অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। শান্তিশতক একখানি সুন্দর নীতিপূর্ণ গদ্যগ্রন্থ। ছাত্রেরা এ সময় অনুবাদ ও সংস্কৃত বঙ্গভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে অভ্যাস করিবে।

অলঙ্কার শ্রেণী

সাহিত্যচর্চার পর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতে আসে ও এখানে দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করে। (পূর্বে এই শ্রেণীর পাঠকাল এক বৎসর ছিল। ১৮৪৬ খ্রীঃর ২৮শে নভেম্বর হইতে দুই বৎসর পড়িবার নিয়ম হয়।) তাহারা এই শ্রেণীতে অলঙ্কার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পুস্তক অধ্যয়ন করে ঃ—

১) সাহিত্য-দর্পণ। ২) কাব্য-প্রকাশ।

৩) কাব্য-দর্শন। ৪) রসগঙ্গাধর।

সাহিত্য শ্রেণীতে সময়াভাবে যে সমস্ত পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিতে পারে না, এস্থলে তাহারা সেই পদ্যগ্রন্থ সমূহ পাঠ করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে অনুবাদ ও রচনা শিক্ষা করিতে হয়। তাহাদিগকে আবার গণিতশ্রেণীতে গমন করিতে হয়। এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমি নিম্নলিখিত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক পাঠ্যপুস্তক হওয়া উচিত। কিন্তু সচরাচর সাহিত্য-দর্পণই পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমি নিম্নলিখিত কারণে কাব্যপ্রকাশ, ও দশরূপক গ্রন্থদ্বয়কে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করি। কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ অপেক্ষা সর্ববিষয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ গ্রন্থ এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ে ইহাই শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। মল্লিনাথের ন্যায় উৎকৃষ্ট টীকাকারগণ তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় পুনঃ পুনঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কাব্যপ্রকাশে নাটকরচনা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। দশরূপকে অলঙ্কার শাস্ত্রের উক্ত বিভাগের সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ নিজ নিজ বিভাগে ইহা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত। সাহিত্য দর্পণ অপেক্ষা কাব্য-

প্রকাশ ও দশরূপক অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে পঠিত হইতে পারে। তন্নিমিত্ত কাব্যপ্রকাশ ও দশরূপক, সাহিত্য-দর্পণের স্থান অধিকার করিতে পারে। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবার পর অপরটি অধ্যয়ন করা কেবল সময় নষ্ট মাত্র। যদি ব্যাকরণ শ্রেণী সংক্রান্ত আমার বক্তব্যগুলি গৃহীত হয়, তবে অলঙ্কার শ্রেণীতে কেবল সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠের আবশ্যকতা থাকে না। এ কারণে যে সময় উদ্বৃত্ত, থাকিবে, তাহা গণিত ও অন্যান্য বিষয়ে নিয়োগ করা যাইতে পারে। তাহার উল্লেখ পরে করিব।

জ্যোতিষ বা গণিতশ্রেণী

সাহিত্য ও জ্যোতিষ শ্রেণীর ছাত্রেরা এই শ্রেণীতেও অধ্যয়ন করে। এখানে তাহারা লীলাবতী ও বীজগণিত পাঠ করে। লীলাবতী ভাস্করাচার্য প্রণীত একখানি অঙ্ক ও পরিমিতি বিষয়ক গ্রন্থ। বীজ-গণিতও উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। উভয় গ্রন্থই অতি সংক্ষিপ্ত। পুস্তক-দ্বয়ে কোন প্রকার শৃঙ্খলা নাই ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় রচিত তৎসদৃশ পুস্তকের ন্যায় উহাতে কিছু নাই। পুস্তকদ্বয় অকারণে অতিশয় কঠিন করিয়া রচিত হইয়াছে। নিয়ম ও প্রশ্নাবলী ছন্দে নিবদ্ধ। এই দুইখানি পুস্তক শিক্ষা করিতে ছাত্রগণের চারি বৎসর লাগে। অধ্যয়নের এই বিভাগে সবিশেষ পরিবর্তনের আবশ্যক। ইংলণ্ডীয় গ্রন্থকারগণের পুস্তক হইতে অঙ্ক, বীজগণিত ও জ্যামিতি সম্বন্ধে পুস্তকাদি সংগ্রহ হওয়া উচিত। এই সকল পুস্তক অধ্যয়নের পর বালকেরা অতি সহজে লীলাবতী ও বীজগণিত পুস্তক শিক্ষা করিতে পারিবে। গণিত বিদ্যার উচ্চতর শাখাসমূহ পরে অনুবাদিত করার চেষ্টা এবং সেগুলিকে পাঠ্যপুস্তক করা উচিত। হার্শেল সাহেবকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ন্যায় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হওয়া উচিত

ও গণিত শ্রেণীতে তাহার পাঠ হওয়া আবশ্যক। ঐ সমস্ত পুস্তক ইংরেজী ভাষাতেই পাঠ্য হইতে পারে; কিন্তু বঙ্গভাষায় অনুবাদ হইলে, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের বিশেষ উপযোগী হইবে। সাহিত্য ও অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রগণ ব্যতীত স্মৃতি ও ন্যায় শ্রেণীর ছাত্রদিগেরও গণিতাধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করা উচিত। এস্থলে সংস্কৃত কলেজের নিম্নশ্রেণীতে কাব্যের শেষ হইল, ইহা বিবেচিত হইতে পারে। এই বিভাগের শ্রেণীসমূহে মনোহর অথচ প্রয়োজনীয় বিষয় সংবলিত বঙ্গভাষায় রচিত পুস্তক সকল অধীত হইবার প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করি; সুতরাং এই প্রস্তাব করি যে, উক্ত পুস্তক সমূহে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবিষ্ট থাকে।

ব্যাকরণের চতুর্থ শ্রেণীর জন্য—পশুসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য—রুডিমেণ্টস অব নলেজ ও চেম্বার্সকৃত গ্রন্থাবলী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য—চেম্বার্স কৃত মরাল ক্লাসবুক।

প্রথম শ্রেণীর জন্য—বিবিধ বিষয়। যথা—মুদ্রণশিল্প, চুম্বকাকর্ষণ, নৌবিদ্যা, ভূমিকম্প, পিরামিড, চীনদেশীর প্রাচীর, মধুমক্ষিকা ইত্যাদি।

সাহিত্য শ্রেণীর জন্য চেম্বার্সকৃত জীবনচরিত ও অন্যান্য চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় বিবিধ বিষয়ক প্রবন্ধ; যথা—টেলিমেকস, রাসেলাস, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনুবাদ সমূহ।

অলঙ্কার শ্রেণীর জন্য—নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকাবলী ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদি।

যদি এডুকেশন কৌন্সিলের অধ্যক্ষ এই সকল ভাষায় রচিত গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট করেন, তবে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা অল্পায়াসে বঙ্গভাষায় সুন্দর পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিবার পুর্বে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান

অর্জন করিতে সমর্থ হইবে ও চিত্তবৃত্তির বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিবে।

পূর্বোক্ত বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছে। বোধোদয় ও নীতিবোধ মুদ্রিত হইতেছে এবং অন্যান্য পুস্তকগুলি প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত পুস্তক প্রচলনের জন্য কৌন্সিলকে কোন অতিরিক্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে না। এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গভাষায় রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সঙ্কলনগুলি প্রস্তুত করিতে কোন আর্থিক আনুকূল্যের প্রয়োজন হইবে না। সংস্কৃত কলেজের গণিত-শ্রেণীর ব্যবহারের জন্য গ্রন্থাবলী, যথা—পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্রঃ এই সকল গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য কৌন্সিল অব্ এডুকেশনের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক ও কৌন্সিলের সঞ্চিত অর্থ হইতে এই বিষয়ে সহজেই সাহায্য করা যাইতে পারে।

স্মৃতি বা আইন শ্রেণী

অলঙ্কার শ্রেণী হইতে ছাত্ররা এই শ্রেণীতে উন্নীত হয় ও এখানে তিনবৎসর কাল অধ্যয়ন করে। পাঠ্যপুস্তকগুলি এই—মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা দ্বিতীয় অধ্যায়, বিবাদচিন্তামণি, দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, দত্তকচন্দ্রিকা, অষ্টবিংশতি তত্ত্ব।

এই শ্রেণী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে অষ্টবিংশতিতত্ত্বের অধ্যাপনা বন্ধ হওয়া উচিত। ইহা যাজন ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগের শিক্ষোপযোগী, ঐরূপ গ্রন্থাদি বিদ্যালয়ে অধীত হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী। অপর পুস্তকগুলি পাঠে কোন প্রতিবন্ধক নাই ও প্রচলিত থাকিতে পারে। উক্ত গ্রন্থাদির অনুশীলনে ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় প্রদেশের হিন্দু-আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে।

ন্যায়শ্রেণী

তর্কশাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাঘটিত ব্যাপার লইয়াই ন্যায়শাস্ত্র। মধ্যে মধ্যে রসায়ন, দৃষ্টিবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধেও উল্লেখ আছে। মীমাংসা ও পাতঞ্জল ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ বলা যাইতে পারে। মীমাংসা ও পাতঞ্জলে ধর্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তার বিষয় উল্লিখিত আছে। চারি বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট—ভাষা পরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, ন্যায়সূত্র, কুসুমাঞ্জলী, অনুমান চিন্তামণি দীধিতি, শব্দশক্তি প্রকাশিকা, পরিভাষা তত্ত্বকৌমুদী, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেক।

এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, উক্ত শ্রেণীকে ন্যায়শ্রেণী নামে অভিহিত না করিয়া, দর্শনশ্রেণী নামে অভিহিত করা উচিত। অনুমান-চিন্তামণি, দীধিতি, খণ্ডনা ও তত্ত্ববিবেকের অধ্যাপনা বন্ধ হউক ও তাহার পরিবর্তে মীমাংসা বা ধর্মানুষ্ঠান সম্বলিত নীতি বাদ দিয়া দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি অধীত হউক,

(১) সাঙ্খ্য প্রবচন (২) পঞ্চদশী
(৩) পাতঞ্জল সূত্র (৪) সর্বসার সংগ্রহ

সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার কাল ১৫ বৎসর মাত্র। তাহাতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে যে, এক ব্যক্তি এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যায় উত্তম পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে। ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে, কেহই সংস্কৃত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা অতি সত্য কথা যে, হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের অধিকাংশের সহিত

আধুনিক সময়ের উন্নত চিন্তার সৌসাদৃশ্য অল্পই লক্ষিত হয়। তথাপি ইহা কখনই অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, একজন সংস্কৃতাভিজ্ঞের পক্ষে উক্ত দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ইংরেজী বিভাগ সম্বন্ধে আমার মন্তব্যগুলি রিপোর্টের স্থানান্তরে উল্লেখ করিব। যদি কৌন্সিল অব্ এডুকেশন আমার মন্তব্যগুলি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা দর্শন শ্রেণীতে উন্নীত হইবে, সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগের শিক্ষিত ইংরেজী ভাষাজ্ঞান অনায়াসেই, তাহাদিগকে ইউরোপ খণ্ডের দর্শনশাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ প্রণিধান করিতে সমর্থ করিবে। তাহারা পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহাদিগের স্বদেশীয় দর্শনশাস্ত্রের তুলনা করিতে সহজেই পারগ হইবে। যুবকেরা এই পদ্ধতি অনুসারে লিখিত হইলে সহজেই প্রাচীন হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে; কিন্তু যদি তাহাদিগকে হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান ইউরোপীয়দিগের নিকট শিক্ষা করিতে হয়, তবে উপরোক্ত সুবিধা তাহাদিগের কখনই ঘটিয়া উঠিবে না। ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার ফলে ছাত্রেরা সহজেই অনুভব করিতে পারিবে যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনশাস্ত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্তকগণ পরস্পরের ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শন করিবার ত্রুটি করেন নাই। ছাত্রের পক্ষে এই সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া তথ্য নির্ণয় করিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে। তাহার ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের দোষগুণ বিচারের পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ-প্রদর্শক হইবে।

ইংরাজী বিভাগ

যে পদ্ধতি অনুসারে এই বিভাগটি অধুনা গঠিত, তাহা অতীব অসন্তোষকর। এই বিভাগে কি শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা ছাত্রের

ইচ্ছাধীন। যখন ইচ্ছা সে তাহার পাঠ আরম্ভ করে ও ইচ্ছানুসারে তাহা পরিত্যাগ করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পরেই ব্যাকরণ শ্রেণীতে সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু একেবারে দুইটি নতুন ভাষা শিক্ষা করিতে তাহাদিগকে বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রই, হয় ইংরেজী কিম্বা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করে; প্রায়ই পরীক্ষার পূর্বে অধিকাংশ ছাত্র ইংরেজী বিভাগ হইতে পলাইয়া আসে। সেই ছাত্ররাই পরবৎসরারম্ভে ভর্তি হইতে আসে। অন্য একটি কারণে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। একটি ইংরেজী বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের শ্রেণীর ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণের বিষয় দেখা যাউক—তৃতীয় শ্রেণীতে ত্রয়োদশটি ছাত্র পাঠ করে; তন্মধ্যে চারিটি স্মৃতি শ্রেণীর ছাত্র, একটি ন্যায়শ্রেণীর, একটি অলঙ্কারশ্রেণীর, তিনটি তৃতীয় ব্যাকরণ শ্রেণীর ও অবশিষ্ট চারিটি চতুর্থ ব্যাকরণ শ্রেণীর ছাত্র। চতুর্থ শ্রেণীতে ৩৩টি বালক অধ্যয়ন করে। তন্মধ্যে ২টি অলঙ্কার শ্রেণীর, ৫টি সাহিত্য শ্রেণীর, ২টি প্রথম ব্যাকরণ শ্রেণীর, ৬টি দ্বিতীয়, ১০টি তৃতীয়, ৬টি চতুর্থ এবং ২টি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বিভিন্ন সংস্কৃত শ্রেণী হইতে ছাত্রেরা ইংরেজী-বিভাগে পাঠ করিতে আসে। ইহাতে এই কুফল উৎপন্ন হয় যে, ছাত্রগণ উক্ত শ্রেণীতে নিয়মমত উপস্থিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং সংস্কৃত শ্রেণীর একাংশ ছাত্র মাত্রই ইংরেজী বিভাগে অধ্যয়ন করে। এই ছাত্রগণ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ছাত্রেরা, উভয়বিধ শিক্ষায় একইসময়ে মনোযোগ দিতে অক্ষম; সুতরাং শিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ উন্নতি দৃষ্ট হয় না।

যদি ইংরেজী বিভাগ এমন অনিয়মে পরিচালিত হয়, তবে ইহার ফল যে নিতান্তই অসন্তোষজনক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয়

নাই। ইংরেজী বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঈদৃশ নিয়মে পরিচালিত হওয়াতেই উহা নিতান্ত মন্দ ফল উৎপন্ন করে ও অবশেষে সাধারণ শিক্ষার জেনারেল কমিটির আদেশে একেবারে উঠিয়া যায়। যদি অপেক্ষাকৃত সুবন্দোবস্ত না করা হয়, তবে পূর্বের ন্যায় ইহা হইতে মন্দ ফলই ফলিবে।

তজ্জন্য আমি যে কয়েকটি বন্দোবস্তের অবতারণা করিতেছি, তাহাকার্যে পরিণত হইলে নিশ্চয়ই সু-ফল উৎপন্ন হইবে। আমার মন্তব্যগুলি এই যে, নিম্নশ্রেণীতে পাঠরত এইসব ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষায় কিছু পারদর্শিতা না দেখাইতে পারিলে তাহাদিগকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিতে দেওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত শ্রেণীর ছাত্রেরা সেই সঙ্গে তাহাদিগের নিজের শ্রেণীতে ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করিবে। ইংরেজী শিক্ষা ইচ্ছাধীন না হইয়া অন্যান্য পাঠের ন্যায় অবশ্য পাঠ্য হইবে। কোন ছাত্র যদি ইংরেজী শিক্ষা করিতে নিতান্তই অনিচ্ছা প্রদর্শন করে, তবে তাহার পক্ষে এই নিয়ম বলবান হইবে যে, পরে কোন সময়েই ভর্তি হইতে পারিবে না। সে ইংরেজী শিক্ষার শ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করিতেছি যে, অলঙ্কার-শ্রেণীতেই ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হউক। তাহা হইলে ছাত্রগণ ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে অন্যূন দ্বিগুণ সময় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে এবং তাহাদিগের চিত্ত এক্ষণে সুমার্জিত হওয়াতে তাহাদিগকে সামান্য বিষয় হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না। অলঙ্কার শ্রেণী হইতে কলেজের শেষ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিতে ৭।৮ বৎসর লাগে। সুতরাং উক্ত সময়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ও শ্রমশীল ছাত্র অনায়াসে ইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিবে।

পঞ্চম ব্যাকরণ শ্রেণী

আমি আর একটি বিশেষ ঘটনা কৌন্সিলের সমক্ষে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি—ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতে বিশেষ সমর্থ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন; সুতরাং নিজের কর্তব্যকর্মগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে অপারগ। অল্পবয়স্ক বালকগণের শ্রেণীতে সুন্দররূপে কাব্য পড়াইতে হইলে, যে কার্যতৎপরতা ও দৃঢ়তার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। প্রাচীন বলিয়া তিনি কাহারও উপদেশের বশবর্তী হইয়া চলিতে অনিচ্ছুক, সুতরাং তাঁহার শ্রেণীতেই বিশেষ গোলযোগের প্রভাব। তন্নিমিত্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, তাঁহার বর্তমান বেতন মাসিক ৪০ টাকা দিয়া তাহাকে লাইব্রেরির ভার দেওয়া হয় ও লাইব্রেরির বর্তমান অধ্যক্ষ, এই বিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ৩০ টাকা বেতনে ব্যাকরণের পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। পরিশেষে সুবিধা ঘটিলে তাঁহার বেতন ৪০ টাকায় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইবে।

শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন

বালকগণের এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নয়ন সম্বন্ধে কলেজের বর্তমান পদ্ধতি এই যে, তাহারা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এক শ্রেণীতে পাঠ করে। পরে সময় অতীত হইলেই, তাহাদিগের বিদ্যার পারদর্শিতা লাভ হইল কিনা সে বিষয় দৃষ্টি না করিয়া তাহাদিগকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়।

এই পদ্ধতি হইতে এই কু-ফল উৎপন্ন হয় যে, কোন শ্রেণীতে

কেহ পাঠ শেষ করিলেও তাহাকে নির্দিষ্ট সময় অতীত না হইলে উপরকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু যদি অপর কোন ছাত্র, সকল বিষয়ে অনুপযুক্ত হইয়াও কোন শ্রেণীতে নির্দিষ্ট সময় সমাপ্ত করে, তবে তাহাকে উপরকার শ্রেণীতে পাঠ করিতে দেওয়া হয়। আমি তজ্জন্য প্রস্তাব করি যে, গুণানুসারে উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হউক। আরও এই নিয়ম প্রচলিত হউক যে, বৃত্তি-সংক্রান্ত নিয়মানুযায়ী সময়ের অতিরিক্ত কাল কেহই কলেজে পাঠ করিতে পারিবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এইরূপ বন্দোবস্ত প্রচলিত হইলে, মন্দবুদ্ধি ছাত্রাপেক্ষা বুদ্ধিমান ছাত্রেরা নির্দিষ্ট সময়ের কমেও নিজ নিজ পাঠ্য শেষ করিতে সমর্থ হইবে।

শৃঙ্খলা রক্ষা

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ে সুবন্দোবস্তের অভাব সকলেরই বিশেষ পরিচিত। বালকগণের উপস্থিতি, সামান্য কারণে শ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া ও অনাবশ্যক গোলমাল ও কথাবার্তা এবং সর্বপ্রকার গোলযোগ সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অন্যান্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে যেরূপ নিয়মান্বিত সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, এই বিদ্যালয়ে কেন যে তাহা প্রবর্তিত হইবে না, তাহার কারণ বুঝিতে পারি না, সেইরূপ প্রণালী বিদ্যালয়েও প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত উচিত।

অবশেষে নিবেদন এই যে, কলেজের সুবন্দোবস্তের নিমিত্ত আমি যে প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, তাহা বহু দিবসের প্রগাঢ় চিন্তা ও বিবেচনার ফল। আমার বিবেচনায় যে প্রণালীর অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে নিতান্তই প্রয়োজনীয়, আমি

কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়াছি ও আশা করি যে, যদি কৌন্সিল আমার প্রস্তাবিত পরামর্শগুলি কার্যে পরিণত করেন, তবে অল্প-দিনের মধ্যেই অতি সুফল উৎপন্ন হইবে ও বিদ্যালয়টি পবিত্র ও প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যার আগারস্বরূপ হইবে। বিশেষতঃ ইহা হইতে জাতীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও সুশিক্ষকের সংঘটন হইতে থাকিবে ও এই বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সুদক্ষ শিক্ষক-গণ সাধারণের মধ্যে জাতীয় বিদ্যা প্রচার করিয়া দেশের সর্বতো-ভাবে মঙ্গলসাধন করিতে থাকিবেন।*

সংস্কৃত কলেজ
১০ই ডিসেম্বর ১৮৫৬ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

---

* বিহারীলাল সরকার কৃত অনুবাদ

"বিহারীলাল সরকারের অনুবাদে মূল রিপোর্টের কিছু কিছু অংশ বাদ পড়েছে, এ'কথা পাঠকের গোচরে রাখা উচিত বলে মনে করছি। তবে অনুবাদে যে সকল স্থানে অর্থবিকৃতি ঘটেছে, সে সকল স্থানে প্রয়োজন মত সংশোধন করা হয়েছে।

—লেখক

শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ডঃ মোয়াটকে লেখা চিঠি

(৭. ৯. ১৮৫৭)

১। ডঃ ব্যালেণ্টাইনের সুপারিশ মত পাঠ্যপুস্তক গ্রহণের বিষয়ে ব্যথিত চিত্তে জানাইতেছি যে, আমি তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে একমত হইতে পারিতেছি না। তিনি 'মিল'-এর তর্কশাস্ত্রের মূলগ্রন্থের পরিবর্তে তাঁহার স্বরচিত সংক্ষিপ্তসার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করিয়াছেন। আমার বিবেচনামতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সংস্কৃত কলেজে 'মিল'-এর গ্রন্থটির পঠন অপরিহার্য। 'মিল'-এর মূল গ্রন্থটির অত্যধিক মূল্যই সম্ভবত ডঃ ব্যালেণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থটির সুপারিশের প্রধান কারণ। আমাদের ছাত্ররা বর্তমানে উচ্চমূল্যের প্রামাণ্য গ্রন্থ ক্রয়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে পিছাইয়া আসিবার প্রয়োজন নাই। এই বিবেচনা অনুসারে ডঃ ব্যালেণ্টাইনের সংক্ষিপ্তসারটি তাঁহার নিজের কথা অনুসারে ভূমিকা স্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারে যাহা মূলগ্রন্থটি যত্ন সহকারে পাঠের পক্ষে সহায়ক হইবে। কিন্তু মহামান্য গ্রন্থকার স্বয়ং ভূমিকায় দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করিয়াছেন যে, আর্চবিশপ 'হোয়াটলে'-র তর্কশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থটি-ই তাঁহার গ্রন্থের সর্বোত্তম ভূমিকা। সুতরাং আমি বিষয়টি পরিষদের বিবেচনার জন্য রাখিলাম। ডঃ ব্যালেনণ্টাইন আরও তিনটি গ্রন্থকে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করিতে সুপারিশ করিয়াছেন, সেইগুলি হইল, টীকাসমেত ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত দর্শনের তিন ধারা—বেদান্ত ন্যায় এবং সাংখ্য বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক। ইহাদিগের মধ্যে বেদান্ত বিষয়ে 'বেদান্তসার' গ্রন্থটি ইতিমধ্যেই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রহিয়াছে এবং ইহার ইংরাজী

ভাষ্য পাঠেও কিছু উপযোগিতা রহিয়াছে। তাঁহার সুপারিশমত অপর দুইটি পুস্তক—'ন্যায়' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক "তর্কসংগ্রহ" এবং 'সাংখ্য' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক 'সত্ত্বসমাস' —উভয় গ্রন্থই স্ব স্ব বিভাগে নিম্নমানের গ্রন্থ। আমাদের পাঠ্যক্রমে ইহাদের অপেক্ষা উচ্চমানের গ্রন্থ রহিয়াছে। 'বার্কলে'-র 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' (Inquiry) পুস্তক প্রসঙ্গে বিনীত নিবেদন এই যে, ঐ গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিলে তাহা উপকারের পরিবর্তে অধিক ক্ষতিসাধন করিবে। বিশেষ কিছু কারণে, যাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন, আমাদের সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য বিষয়ে শিক্ষাদান প্রচলিত রাখিতে হইয়াছে। বেদান্ত এবং সাংখ্য যে ভ্রান্ত চিন্তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবিষয়ে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নাই। ভ্রান্ত হইলেও এই দর্শন হিন্দুদের মনে অপরিসীম শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহাদের প্রভাব উপশমিত করিবার নিমিত্ত সংস্কৃত পাঠক্রমে এইগুলি পড়াইবার পাশাপাশি ইংরাজী পাঠক্রমে কোন বলিষ্ঠ দর্শন পাঠের সাহায্যে এই মতবাদের বিরুদ্ধ চিন্তাকে উপস্থাপিত করিতে হইবে। বিশপ 'বার্কলে'-র 'তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা' (Inquiry) গ্রন্থটি বেদান্ত বা সাংখ্য দর্শনের প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে এবং ইউরোপেও ইহা বর্তমানে আর বলিষ্ঠ দর্শন হিসাবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং ইহার সাহায্যে উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। পক্ষান্তরে এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিয়া সংস্কৃত পাঠরত হিন্দুছাত্ররা যখন অবগত হইবে যে সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের তত্ত্বসমূহ ইউরোপীয় দার্শনিকের তত্ত্বেও সমর্থিত হইতেছে তখন দর্শনের এই দুইটি শাখার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা হ্রাস পাওয়ার বিনিময়ে বৃদ্ধি পাইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বিশপ 'বার্কলে'-র গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করিবার বিষয়ে আমি ডঃ ব্যালেণ্টাইনের সুপারিশের সহিত একমত হইতে পারিলাম না।

২। আমি বিনয়াবনত চিত্তে আরও জানাই যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রচলিত ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় পাঠক্রমই উত্তম ডঃ ব্যালেন্টাইন এইকথা স্বীকার করিয়াও শিক্ষার্থীরা যাহাতে 'সত্য দ্বিবিধ' এইরূপ ভ্রান্ত ধারণায় উপনীত হইতে না পারে পূর্বাহ্নেই সেই বিপদের সম্ভাবনায় উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রাখিতে চান। তজ্জন্য ডঃ ব্যালেন্টাইন যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার সহিত সম্পূর্ণভাবে একমত হইতে পারিতেছি না। এই আশঙ্কা যে কেবলমাত্র কাল্পনিক নহে তাহার উদাহরণ স্বরূপ ডঃ ব্যালেনন্টাইন উল্লেখ করিয়াছেন যে, সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী এবং ইংরাজী ভাষায়ও জ্ঞান রহিয়াছে এমন অনেক ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে তিনি আসিয়াছেন যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রের তত্ত্বসমূহ সঠিক এবং হিন্দুদের ন্যায়শাস্ত্রও সঠিক অথচ তাহাদের এই দুই তত্ত্বের একাত্মতা সম্বন্ধে উপলব্ধির সেই গভীরতা নাই যাহার দ্বারা একটির ধারাবাহিক তত্ত্বসমূহ অপরটির ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন আমি বিশ্বাস করি, ডঃ ব্যালেন্টাইন যে বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহা যে ব্যক্তি বুদ্ধিমত্তার সহিত ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য পাঠ করিয়াছে তাহার ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী নহে। সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলে সত্যকে সত্য বলিয়াই বোধ হইবে। সত্য সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফলেই 'সত্য দ্বিবিধ' এরূপ বিশ্বাস জন্মাইতে পারে এবং আমি নিশ্চিত যে, আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা যে উন্নততর পাঠক্রম গ্রহণ করিয়াছি, তাহার ফলে এই বিভ্রান্তি অপসৃত হইবে। যদি কোন বুদ্ধিমান ছাত্র, প্রকৃত একাত্মতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও 'সত্য যে এক' তাহা উপলব্ধি করিতে অপারগ হয়, তাহা হইলে উহাকে একটি বিরল দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে। অনুমান করি যে ছাত্ররা তর্কশাস্ত্র অথবা বিজ্ঞান অথবা দর্শনের কোন বিষয় ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই পাঠ করিল। এইবার যদি দেখা যায় যে,

এই ছাত্ররা দৃঢ়ভাবে বলিতেছে যে, ইউরোপীয় তর্কশাস্ত্র নির্ভুল এবং হিন্দুশাস্ত্র-ও নির্ভুল অথচ উভয় শাস্ত্রের একাত্মতা এরূপভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই যাহাতে একটির ধারাবাহিক বিন্যাস অপরটির ভাষায় প্রকাশে সক্ষম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় তাহারা বিষয়টি যথেষ্ট প্রাঞ্জলভাবে বুঝিতে পারে নাই অথবা সেই ভাষার সহিত তাহারা যথেষ্ট পরিচিত নহে। এই কারণে সেই ভাষায় নিজেদের প্রকাশ করিতে তাহারা অসমর্থ। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, হিন্দুদর্শনে এমন অনেক অংশ রহিয়াছে যাহা স্বচ্ছন্দে ও প্রাঞ্জলভাবে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব নহে কারণ তাহার মধ্যে সারবস্তু কিছুই নাই।

৩। আমি শ্রদ্ধাবনতচিত্তে আরও জানাইতেছি, আমি দুঃখিত যে, ডঃ ব্যালেন্টাইনের নিম্নলিখিত মন্তব্য সম্পর্কে কিছুটা দ্বিমত পোষণ না করিয়া আমি পারিতেছি না। ডঃ ব্যালেন্টাইন বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত কলেজের বর্তমান গঠনতন্ত্রে ইংরাজী পাঠক্রম ও সংস্কৃত পাঠক্রম উভয়ের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হইল এই যে, কিছু ব্যক্তিকে এমনভাবে শিক্ষিত করা যে, তাহারা ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় পণ্ডিতদের বিষয়ে অবগত হইবে এবং অনাবশ্যক সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের মধ্যে যেক্ষেত্রে আপাতবিরোধ রহিয়াছে সেক্ষেত্রে-ও প্রকৃত সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবে এবং হিন্দুমনীষিগণ যে সকল মৌলিক সত্য অনুমান করিয়াছিলেন ইউরোপীয় বিজ্ঞান সেইগুলিকেই স্বীকৃতি দিতেছে, এই বুঝাইয়া তাহারা ইউরোপের উন্নতিশীল বিজ্ঞানকে এদেশে গ্রহণের জন্য প্রভাবিত করিতে সমর্থ হইবে। আমার আশঙ্কা, সকল ক্ষেত্রে আমরা হিন্দুশাস্ত্র ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইব না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সকল ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য নির্ণয় করা সম্ভব হইবে তাহা হইলেও আমার মনে হয় যে, ভারতীয় পণ্ডিতদের উন্নতিশীল ইউরোপীয়

বিজ্ঞান গ্রহণে সম্মত করাইতে যাওয়া হইবে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা। তাঁহারা হইতেছেন এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তি যাঁহারা দীর্ঘদিনের সংস্কারে অনড়। নূতন কোন সত্য অথবা কোন সত্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা যাহার মূল হয়তো তাঁহাদের শাস্ত্রের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, এরকম কোন নূতন চিন্তাধারা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিবেন না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁহারা একগুঁয়েভাবে তাঁহাদের প্রাচীন সংস্কারের প্রতি অনুগত থাকিবেন। ইঁহাদের শ্রেণীচরিত্র বুঝাইবার জন্য খলিফা ওমরের কাহিনীর উদ্ধৃতি সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হইবে। আলেকজান্দ্রিয়া জয় করিয়া আরব সেনাপতি, ওম্‌র্‌, খলিফা ওমরকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে, তখন খলিফা প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, গ্রন্থগুলিতে যাহা রহিয়াছে তাহা হয় কোরাণেরই অনুরূপ অথবা তাহা নহে। যদি ঐ বিষয়বস্তু কোরাণে থাকে তাহা হইলে ঐ গ্রন্থগুলি ব্যতিরেকে কোরাণ-ই যথেষ্ট এবং যদি কোরাণে না থাকে তাহা হইলে উহারা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং ঐগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলা-ই বাঞ্ছনীয়। আমার বলিতে খুব লজ্জাবোধ হইতেছে যে, ভারতীয় পণ্ডিতদের গোঁড়ামি আরবীয়দের চেয়ে কোন অংশে কম নহে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের শাস্ত্রসকল সর্বজ্ঞ ঋষিগণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সুতরাং সেইগুলি অভ্রান্ত না হইয়া পারে না। আলোচনা প্রসঙ্গে বা কথোপকথন সূত্রে যদি ইউরোপীয় কোন নূতন সত্য তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা হাসিবেন এবং বিদ্রূপ করিবেন। সম্প্রতি ভারতের এই অঞ্চলে বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও তাহার আশেপাশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একটি চিন্তাধারা বিকশিত হইতেছে যে, যখনই তাঁহারা এমন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য সম্বন্ধে অবহিত হন যাহার মূলসূত্রের সন্ধান হয়তো তাঁহাদের শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলে সেই সত্য সম্বন্ধে

শ্রদ্ধা পরিদর্শনের পরিবর্তে বিজয় গৌরবে নিজেদের শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের কুসংস্কারগ্রস্ত শ্রদ্ধা, চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। এই সকল বিবেচনা হইতে আমি দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি যে, ভারতীয় পণ্ডিতদের নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণের ব্যাপারে সমন্বয় স্থাপন করিবার কোন আশা আছে একথা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের প্রদেশগুলিতে, যেখানকার অভিজ্ঞতা হইতে ভারতীয় পণ্ডিতদের সম্পর্কে ডঃ ব্যালেন্টাইন উপরোক্ত ধারণায় উপনীত হইয়াছেন, সেই স্থানে তাঁহার অভিমত সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে।

৪। বাংলা দেশে অবস্থা ভিন্নরূপ। তাঁহার মন্তব্য,—'দুই অঞ্চলের পরিবেশ ভিন্ন অবস্থায় বিচার করিতে হইবে, এবং 'প্রক্রাস্টাস-এর বিছানা'* শাসনতান্ত্রিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট ধরণ নয়, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। ভারতের এ অঞ্চলের স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতা আমাদের ব্যবস্থিত শিক্ষাদানের জন্য ভিন্ন পথ অনুসরণে বাধ্য করিয়াছে। যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে আমি এখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়াছি আর আমার ধারণা, পণ্ডিতদের কোন মতেই ঘাঁটানো উচিত নয়। তাহাদের এসব মানাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করার দরকার নাই, কারণ আমাদের কোন ভাবেই তাহাদের সাহায্য দরকার নাই। বাঙলার যেখানেই শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে, সেখানেই দেশের পণ্ডিতদের পিছু হটিয়া যাইতে হইতেছে। বাঙালীরা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণে অতি

[*প্রক্রাস্টাস গ্রীক পুরাণে উল্লেখিত এক দানব। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে প্রক্রাস্টাস নিত্য নূতন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে নানারূপ খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করিত। আহার শেষে সে অতিথিকে একটি নির্দিষ্ট মাপের খাটে শুইতে দিত। যদি, অতিথির দৈর্ঘ্য খাটের মাপের চেয়ে বড় বা ছোট হইত তাহইলে প্রক্রাস্টাস তাহাকে ধারাল অস্ত্র দিয়া ছাঁটিয়া দিত অথবা টানাটানি করিয়া তাহার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করিত যতক্ষণ না তাহার মাপ খাটের মাপের সমান হইত। বলা বাহুল্য যে ইহাতে অতিথির মৃত্যু ঘটিত।]

উৎসুক। দেশের বিভিন্ন অংশে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের জ্ঞানীদের মানাইয়া লইবার চেষ্টা না করিয়া কি করা যাইতে পারে তাহা আমরা জানিয়াছি। আমাদের প্রয়োজন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার সুবিধা বিস্তার। আমাদের অনেকগুলি বাঙলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হউক, প্রয়োজনীয় ও শিক্ষামূলক বিষয়ে একসার বাঙলা পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিতে দেওয়া হউক, শিক্ষকের দায়িত্বশীল কর্তব্য পালনের উপযোগী শিক্ষিত একদল লোক তৈরি করিতে দেওয়া হউক, তাহা হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এইসব শিক্ষকের যোগ্যতা এই ধরনের হওয়া উচিত—নিজ ভাষায় নিখুঁতভাবে শিক্ষিত, প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় তথ্যের অধিকারী এবং স্বদেশের কুসংস্কারাদি হইতে মুক্ত। এমন একদল প্রয়োজনীয় লোক সৃষ্টিই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আর তাহা পূরণ করিবার জন্যই আমাদের সংস্কৃত কলেজের সমস্ত ক্ষমতা পরিচালিত করা দরকার। আমাদের সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা কলেজের পাঠ শেষ করিয়া এই জাতের মানুষ হইবে এই আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ আশা অলীক নহে। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যে বাংলা ভাষায় পুরোপুরি দক্ষ হইবে, তাহা সন্দেহাতীত। যদি ইংরাজী বিভাগের প্রস্তাবিত নবগঠন মঞ্জুর করা হয়, তাহা হইলে তাহারা ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট দক্ষতা লাভ করিবার প্রচুর সম্ভাবনা ও তাহার ফলে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জানিবে। ইহা খুবই আনন্দের কথা যে, ইদানীং লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহারা এমনভাবে ভাবিতে শুরু করিয়াছে যে, প্রত্যাশা করা যাইতে পারে ইহার পর প্রত্যেকটি উত্তীর্ণ ছাত্রই তাহার দেশবাসীর কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইবে।

সংস্কৃত কলেজ হইতে কতটা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে তাহার নমুনা হিসাবে আমি বিগত বৎসরের এক প্রবীণ ছাত্রের একটি বাংলা রচনার ইংরাজী অনুবাদ আপনার অবগতির জন্য পাঠাইলাম।

ছেলেটির কলেজের শিক্ষা সমাপন করিতে এখনও তিন বৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে সে সামান্য-ই দক্ষতা অর্জন করিয়াছে।

৫। উপসংহারে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমি জানাইতেছি যে, আমি যদি প্রকৃতই এইরূপ সৌভাগ্যবান হই যে, সংস্কৃত কলেজে যেরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, যদি তাহা প্রচলিত রাখিবার অনুমতি পাওয়া যায় তাহা হইলে আমি সংসদকে নিশ্চিত করিয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, সংস্কৃত কলেজ বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ় সংস্কৃত শিক্ষণের পীঠস্থান হইয়া উঠিবে এবং সেই সঙ্গে উন্নততর দেশীয় সাহিত্যের-ও শিক্ষাদান কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবে। এখান হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ তাহাদের নিজ দেশের জনসাধারণের মধ্যে সেই সাহিত্যের জ্ঞান বিস্তারের উপযোগী হইয়া উঠিবে।

৬। ডঃ ব্যালেণ্টাইনের প্রতিবেদনের মূল অনুলিপি যাহা আপনার পত্রের সহিত পাঠাইয়াছিলেন তাহা এইসঙ্গে প্রত্যর্পিত হইল।*

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ।

*[মূল ইংরাজী রচনা থেকে শ্রীসত্যব্রত চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত]

পরিশিষ্ট—৩

বাংলা শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য

১। ব্যাপকভাবে ও সুষ্ঠু পরিচালনায় বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন; কারণ একমাত্র এর মধ্যেই জনসাধারণের অধিকাংশের উন্নতি করা সম্ভব।

২। মাত্র অক্ষর পরিচয়, হস্তাক্ষর শিক্ষা ও সামান্য পাটিগণিতের মধ্যেই এই শিক্ষাকে সীমিত রাখা উচিত হবে না। ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী, পাটিগণিত, জ্যামিতি, প্রকৃতি বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, এবং শারীরবিদ্যাও এই শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত।

৩। যে সব প্রথমিক রচনা এই সব বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে তা হল :—

১ম : পাঁচখণ্ড শিশুশিক্ষা : প্রথম তিনখণ্ড অক্ষর পরিচয়, বানান এবং পাঠ; চতুর্থখণ্ড রুডিমেণ্টস অফ নলেজের একটি ছোট সংকলন; পঞ্চম 'চেম্বারস্ এডুকেশানাল কোর্সে'র মরাল ক্লাস বুকের স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ।

২য় : পশ্বাবলী অথবা জীবতত্ত্ব।

৩য় : মার্শম্যানের বাংলার ইতিহাস-এর (হিসট্রি অফ্ বেঙ্গল) স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ।

৪র্থ : চারুপাঠ অথবা প্রয়োজনীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়াবলী।

৫ম : জীবনচরিত :—চেম্বারস্ একজেপ্লারী বাওগ্রাফীর

অন্তর্গত কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন, স্যার উইলিয়াম হার্শেল, গ্রটিয়স্, লিনোয়ুস, হ্যভাল, সার উইলিয়ম জোনস এব টমাস জেনকিনস এর জীবনীর স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ।

৪। পাটিগণিত, জ্যামিতি ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের বই প্রস্তুতির পথে। ভূগোল, অর্থনীতি, শারীরবিদ্যা, এবং ইতিহাস ও জীবন-চরিতগুলি সংগ্রহ করতে হবে। এখনকার মতো ভারতবর্ষ, গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাসই যথেষ্ট।

৫। একটি বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষক যথেষ্ট নয়—দু'জন করে শিক্ষক প্রয়োজন। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে সম্ভবতঃ তিন থেকে পাঁচটি শ্রেণী থাকবে—একজন শিক্ষকের পক্ষে সুষ্ঠু ভাবে সেগুলি পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৬। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিচার করে পণ্ডিতদের বেতন, কম করেও মাসে ৩০, ২৫ ও ২০ টাকা করা উচিত। উপরে বর্ণিত সব বই প্রস্তুত হয়ে গেলে, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে একজন মাসিক ৫০ টাকা বেতনের হেড পণ্ডিত নিয়োগ করতে হবে।

৭। বেতন নেবার জন্য যাতে শিক্ষকদের প্রতিমাসে কর্মস্থল ত্যাগ না করতে হয় এবং তাঁরা যাতে প্রত্যেক মাসে নিয়মিত বেতন পান সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। এই কাজের জন্য এখন চারটি জেলাকে বেছে নিতে হবে। যথা :—হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান, ও মেদিনীপুর। এখনকার মতো ২৫টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হোক এবং উপোযোগিতা অনুসারে এগুলি বণ্টন করা হবে। এগুলি, গ্রামে ও শহরে, ইংরেজি কলেজ ও বিদ্যালয় থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে। ইংরেজি কলেজ ও বিদ্যালয়ের কাছাকাছি স্থাপিত হলে বাংলা শিক্ষা যথাযোগ্য মূল্য পাবে না।

৯। বাংলা শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে সক্রিয় ও দক্ষ পরি-

দর্শনের উপর ও কৃতিছাত্রদের যথাযোগ্য উৎসাহদানের উপর নির্ভর করবে। এদেশীয়দের মধ্যে জ্ঞানার্জনের জন্যই জ্ঞানার্জনের স্পৃহা এখনও জন্মায় নি। সুতরাং এখন লর্ড হার্ডিঞ্জের যে প্রস্তাব একদিন স্থগিত ছিল তা কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

১০। পরিদর্শনের ব্যাপারে, অন্য যে কোন প্রস্তাব থেকে নীচের প্রস্তাব, অধিকতর স্বল্পব্যয়ে ও অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে সংঘটিত হতে পারে।

১১। পরিদর্শনের জন্য রাহা খরচ সহ মাসে ১৫০ টাকা বেতনে, একজন মেদিনীপুর ও হুগলির জন্য, অপরজন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য, এই দুইজন এদেশীয় পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। এঁদের ঘন ঘন বিদ্যালয় সমুহে যেতে হবে, ছাত্রদের পরীক্ষা করতে হবে ও পাঠপদ্ধতি সংশোধন করতে হবে।

১২। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকারবলে প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন। তিনি এই কাজের জন্য, যাতায়াতের খরচা বাবদ, বছরে সর্বোচ্চ তিনশ টাকা ছাড়া অন্য কোন ভাতা পাবেন না। পাঁচ বছরে অন্তত একবার বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে হবে এবং বাংলা শিক্ষার দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে তাঁর কাছে পরিদর্শনের বিবরণী পেশ করতে হবে।

১৩। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন ও শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব প্রধান পরিদর্শকের উপর থাকবে।

১৪। সাধারণ শিক্ষার স্থান ছাড়াও সংস্কৃত কলেজকে বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষানবিশির জন্য নর্মাল স্কুল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১৫। এর ফলে শিক্ষকদের শিক্ষানবিশি, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও নির্বাচন, শিক্ষক নির্বাচন, এবং সাধারণ পরিদর্শন একটি কার্যালয়-এ কেন্দ্রীভূত হবে। এর ফলে অনেক অসুবিধা দূর হবে।

১৬। মাসিক ১০০ টাকা বেতনে একজন সহকারী প্রধান

পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। তাঁর কাজ হবে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে, শিক্ষক শিক্ষণ ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় সাহায্য করা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তাঁর পক্ষে কাজ করা।

১৭। গুরুমহাশয়দের অধীনস্থ পাঠশালা বা দেশীয় বিদ্যালয়-গুলি বর্তমানে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলি অনুপযুক্ত শিক্ষকদের অধীনে আছে। এই বিদ্যালয়গুলির উন্নতি একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন ও সাধ্যানুসারে শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া পরিদর্শকদের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। উপরে বর্ণিত পাঠ্যপুস্তক-গুলি এইসব বিদ্যালয়ে যতটা সম্ভব প্রচলন করার সুযোগ সন্ধানও পরিদর্শকদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই বিদ্যালয়গুলিকে যোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য তাঁদের যত্নবান হতে হবে।

১৮। এদেশীয়দের দ্বারা বা মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উপযুক্ত শিক্ষকদের অধীনের বিদ্যালয় সমূহের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং উৎসাহ দিতে হবে। পরিদর্শকদের এই সব বিদ্যালয়ে যেতে হবে এবং আরো উন্নতির জন্য এঁদের প্রয়োজন জানাতে হবে।

১৯। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের সরকারি বিদ্যালয়ের আদর্শে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুপ্রাণিত করাও পরিদর্শকদের নিজের দায়িত্ব বলে মনে করতে হবে।

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪ (স্বা ঃ) ঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্মা।

(উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সঙ্কলিত 'বিদ্যাসাগর' থেকে)

পরিশিষ্ট—৪

Henry Woodrow, Inspector of Schools says in his report, dated 18 September 1858.

'.....Pandit Ishwar Chunder Bidyasagar opened forty female Schools, secured an attendance of more than 1300 girls of good caste, and soon found himself liable for between three and four thousand rupees."

W. Gordon Young, Director of Public Instruction, in his letter dated, 18 August, 1858 to C. T. Buckland Junior Secretary to the Government of Bengal—

"It is not necessary that I should dwell at any length upon services so well known to the Lieutenant Governor as are those of Pundit Eshwar Chunder Surma. Suffice it to say he has laboured earnestly and to good purpose in the cause of Native Education, and has established a claim to the gratitude of the Government and of his country-men on this account."

E. B. Cowell who assumed charge of the Sanskrit College after Vidyasagar had resigned—

Pundit Ishar Chunder Vidyasagar's two grand improvements—(1) the making the study of English compulsory on all except the very lowest classes and (2) the introducing of an easy Sanskrit grammar in Bengali instead of the cumbersome old grammar written in Sanskrit, were the cardinal points of the reform which has been gradually produced ; and I only wish to be

considered as having helped to carry out a series of improvements which were certainly inaugurated by the late Principal."

C. Beadon, Secretary to the Government of India, Home Department—(22.12.1858)

"It is to be regretted that the Pundit's scheme of opening female schools on a plan opposed to the orders of the Hon'ble Court, but in the name of the Government and in anticipation of sanction should not have been discouraged at once. As it is evident, however that the Pundit acted in good faith, and with the encouragement and approbation of his superiors. His honour in council is pleased under all the circumstances, to relieve him from responsibility for the sum of Rupees 3.439-3-3 actually expended on these schools, and to direct that it be paid by the Government."

H. L. Harrison, Officiating Inspector of Schools—

"The best aided girls school in my division is at Beersingha, the home of Babu Eshur Chunder Bidyasagar, whose daughter is the most forward girl I have met with in any of the aided schools."

Henry Woodrow, Inspector of Schools in his report for 1870-71—

"The Metropolitan Institution, under the management of Pundit Iswar Chunder Bidyasagar, is the best of these schools and was at the last University Examination one of the most successful schools in India."

A. W. Croft, Director of Public Instruction

(General Report on Public Instruction……1881-82)

"The Metropolitan Institution is the only un-aided college which regularly teaches the full University Course in Arts....."

C. H. Tawney, Director of Public Instuction (Report for 1888-89)

"The Metropolitan Institution continues to be by far the largest of all the colleges in the province and probably in India....."*

---

* Unpublished Letters of Vidyasagar Edited by Arabinda Guha.